রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিম

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

দে'জ পাবলিশিং। কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম সংস্করণ
বৈশাখ ১৩৬৭

প্রকাশক : শ্রীসুধাংশুশেখর দে, দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০০৭৩
মুদ্রাকর : শ্রীবংশীধর সিংহ, বাণী মুদ্রণ, ১২
নরেন সেন স্কোয়ার, কলিকাতা ৭০০০০৯।

রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিম

লেখকের কথা

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে আমার সাম্প্রতিক দশটি লেখা সন্নিবেশিত হয়েছে এই বইতে। প্রথম রচনাটির নামেই বইয়ের নাম রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিম।

এই রচনাগুলির প্রায় সব ক'টিতে বঙ্কিমকে ঘিরে সেদিনের দেশ কাল ও মানুষের ছবি আঁকতে চেয়েছি। তাই আমার আলোচনায় বঙ্কিমপ্রসঙ্গে এসেছেন নটী বিনোদিনী, স্বর্ণকুমারী দেবী, সরলা দেবী; এসেছেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ, অমৃতলাল বসু, মধুসূদন দত্ত; উপস্থিত হয়েছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর বিখ্যাত সাহিত্যিক পুত্রেরা—দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ঈর্ষা কলহ ভালোবাসা প্রশ্রয়—একালের মত সেকালেও কিছু কম ছিল না। বঙ্কিমকে সাহিত্যের সেই চিরকালের সিংহাসন থেকে একেবারে পাবলিক থিয়েটার মঞ্চে এনে খুব কাছ থেকে তাঁকে আমরা দেখতে চেষ্টা করেছি। গত শতকে সাহিত্যের রঙ্গমঞ্চে প্রধান পুরুষ ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রই। একালে বসে সেদিনের সেই রঙ্গমঞ্চে সত্যিই যদি কিছু আলোকসম্পাত করতে পারি তবেই আমার এ-লেখাগুলির সার্থকতা।

অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য

সূচী

রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিম ৯ | সাগর ও সম্রাট ৩২ | মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র ৫৩ | ঠাকুরবাড়ি ও বঙ্কিম ৬২ | শরতের বঙ্কিমচন্দ্র ৮৮ | সেকালে বঙ্কিমচন্দ্রের বইয়ের বাজার ৯৩ | উপন্যাসের বর্জিত কাহিনী ১০২ | আত্মহত্যা ১০৮ | লিটল ম্যাগাজিন ও বঙ্কিম ১১৭ | বঙ্কিম বিষয়ক প্রস্তাব ১২৮ |

অধ্যাপক ডক্টর জীবেন্দ্র সিংহরায়

শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের অন্যান্য বই

রবীন্দ্রনাথ: সাধনা ও সাহিত্য। নানা রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ কেমন করে লিখতেন। রবীন্দ্র-উপন্যাসে পাঠভেদ। অন্যোন্যদর্শন: বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত 'বঙ্কিমচন্দ্র' [সম্পাদিত]। বঙ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন। বঙ্কিমচন্দ্রকৃত সাহিত্য-সমালোচনা: দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগ্রহ। বঙ্কিমসাহিত্য। উনবিংশশতকে বাংলা সাহিত্যেতিহাস-চর্চা। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিম

"বঙ্কিমবাবু মহাশয় নিজে বলিয়াছিলেন যে—আমি মনোরমার চিত্র পুস্তকেই লিখিয়াছিলাম, কখনো যে প্রত্যক্ষ দেখিব এমন আশা করি নাই ; আজ বিনোদের অভিনয় দেখিয়া সে ভ্রম ঘুচিল।"

—বিনোদিনী দাসী

অমৃতলাল বসু একবার বলেছিলেন, "যে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা আজ সাহিত্যগুরু বলে থাকি, থিয়েটারই তাঁকে সর্বসাধারণের চোখের সামনে ফুটিয়ে দিয়েছে।" এই অমৃত-বচনটি সর্বাংশে স্বীকার করে নেবার মত কোনো যুক্তি আমাদের নেই ; তবে কথাটার গুরুত্ব আমরা একেবারে অস্বীকারও করতে পারি না। আমরা বলি, শুধু বঙ্গসাহিত্যের ইতিবৃত্তেই নয়, বঙ্গীয় নাট্যশালা বা বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসেও বঙ্কিমচন্দ্রের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অবদান রয়েছে। এবং এই শাখায় নাট্যকার মধুসূদন দীনবন্ধু ও গিরিশচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র এক আসনে বসার অধিকারী। বঙ্গরঙ্গমঞ্চের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয় কিছু পরিমাণে ঋণী—তাঁর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে রঙ্গমঞ্চের ভূমিকা অস্বীকৃত হবার নয় ; কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না যে বঙ্কিমচন্দ্রের নিকটেও বঙ্গীয় নাট্যশালা বিশেষভাবে ঋণী, এবং সে ঋণের পরিমাণটাও সামান্য নয়।

যে-বঙ্কিমের নিকট বঙ্গীয় নাট্যশালার ঋণের কথা বলছি, সেই বঙ্কিম নিজে কিন্তু একখানিও নাটক লিখলেন না সারা জীবনে। উপন্যাস লিখলেন, সাহিত্য-সমালোচনা করলেন, কবিতা লিখলেন, পত্রিকা চালালেন—কিন্তু নাটক লেখায় হাত দিলেন না কখনো।

সে-যুগে বঙ্কিমের অনেক ক্ষুদ্র-শত্রু ছিল—তাঁদেরই একজন লিখেছিলেন :

উপন্যাসে মজা লুটে কাব্যের বাজারে।
সুরসিক কোন কবি উঁকি-ঝুঁকি মারে।

ইনি যে সমালোচক সুপ্রসিদ্ধ সম্পাদক
লিখেছেন বঙ্গদেশে বহু উপন্যাস।
কবিতা পুস্তকে এঁর বিদ্যার প্রকাশ,
বিশ্বকর্মা শিল্পকর জগন্নাথে চরাচর
সহজেই বুঝিয়াছে ; ওগো সম্পাদক!
সব হলো বাকি কেন বাঙ্গালা নাটক ?

শ্রীশচন্দ্র মজুমদার একবার বঙ্কিমচন্দ্রকে বলেছিলেন—এবার একটা নাটক লিখতে চেষ্টা করুন না কেন ? উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেন—কার জন্য লিখব ? তেমন শ্রোতা নেই, তেমন অভিনেতা নেই, তারপর নাটকের ভাষাও এখনো তৈরি হয়ে ওঠেনি। শ্রীশচন্দ্র বলেছিলেন—মৃণালিনীর সপ্তম সংস্করণে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, আগাগোড়া তো-প্রায় নাটক। বঙ্কিম কথাটা অস্বীকার করেন নি ; বলেছিলেন—থিয়েটারে আমার বইয়ের যে দুর্দশা করা হয়েছে তা দেখে ওরকম করতে হয়েছে আমাকে।[১]

চুঁচুড়ায় এই মৃণালিনী উপন্যাসেরই একবার অভিনয় দেখতে দেখতে বঙ্কিমচন্দ্র কিরকম আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন তার বিবরণ পাই শচীশ চট্টোপাধ্যায়ের বঙ্কিম-জীবনী বইটিতে। "অনেক গণ্যমান্য লোক অভিনয় দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রও অবশ্য উপস্থিত ছিলেন। তিনি একাগ্রচিত্তে ব্যোমকেশের অভিনয় দেখিতেছিলেন। যেখানে ব্যোমকেশ মৃণালিনীর হাত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে, আর পদাঘাত খাইয়া বলিতেছে, 'ও চরণস্পর্শে মোক্ষপদ পাইব। সুন্দরী তুমি আমার দ্রৌপদী—আমি তোমার জয়দ্রথ'—সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র আত্মহারা ও বাহ্যজ্ঞান-বিরহিত হইলেন। তারপর যখন অকস্মাৎ গিরিজায়া ব্যোমকেশের পশ্চাতে আসিয়া তাহার পৃষ্ঠে দংশন করিল

---

১ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত বঙ্কিম-রচনাবলীতে সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাসের মন্তব্য, "মৃণালিনীতে পাঠ পরিবর্তন, পরিবর্জন, সংশোধন এত বেশি যে সবগুলি লিপিবদ্ধ করিলে একটি স্বতন্ত্র পুস্তক হয়।"

ও বলিল, 'আর আমি তোমার অর্জুন'—তখন বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া চেয়ার ছাড়িয়া মহাবেগে লাফাইয়া উঠিলেন। তাঁহার এ কার্য অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছিলেন, লক্ষ্য করিবার বিষয়ও বটে।"

দুর্গেশনন্দিনীর প্রথম ছত্রটি মনে পড়ে। "৯৯৭ বঙ্গাব্দের নিদাঘশেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন।" এর পৌনে তিনশো বছর পরে এই মানুষটি একেবারে জ্যান্ত আরবী ঘোড়ায় চড়ে বঙ্গের রঙ্গমঞ্চে এসে উপস্থিত হলেন—যেমন তেজী সেই শ্বেতবর্ণ অশ্ব তেমনি সুদর্শন তার অশ্বারোহী পুরুষ। সেটা ১৮৭৩ সালের ডিসেম্বর মাসের কথা। বাঙালী পাঠক এতদিন দুর্গেশনন্দিনীর জগৎসিংহকে ছাপার হরফের মধ্যেই দেখে এসেছিল, এখন কলকাতার বেঙ্গল থিয়েটারের মঞ্চে তাকে চোখের সামনে অশ্বপৃষ্ঠে দেখতে পেয়ে চঞ্চল হয়ে উঠল। নিশীথে শৈলেশ্বরের মন্দিরে একদিন জগৎসিংহ সুন্দরী তিলোত্তমাকে দেখে তার রূপে মুগ্ধ হয়েছিল; বেঙ্গল মঞ্চে মহারাজ মানসিংহের পুত্রের সঙ্গে বঙ্গজননীর সন্তানেরাও তিলোত্তমাকে কাছের থেকে দেখতে পেয়ে মুগ্ধ এবং পুলকিত হলেন। সৌন্দর্যে মুগ্ধ কে নয়? জগৎসিংহের ভূমিকায় শরৎচন্দ্র ঘোষ এবং তিলোত্তমার ভূমিকায় জগত্তারিণী অভিনয় করেন। তবে আয়েষার চরিত্রে রূপদান করেন জনৈক পুরুষ অভিনেতা। রূপসজ্জার গুণে অভিনয়ের নৈপুণ্যে ও গল্পের আকর্ষণে আয়েষা যে মহিলা নয় সে-কথা সে-রজনীতে বোঝে কে?

বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের ইতিহাসে শরৎচন্দ্র ঘোষের জগৎসিংহের অভিনয় প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। সেকালের সুবিখ্যাত নটী বিনোদিনী দাসী তাঁর 'আমার কথা'য় বেঙ্গলের স্টেজ ও অশ্বারোহী অভিনেতা শরৎচন্দ্র ঘোষের কথা লিখে গেছেন। "প্লাটফরমের আগাগোড়া মাটি—মাঝে খানিকটা তক্তা বসানো, নীচে সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গপথ দিয়ে স্টেজের ভেতর হতে বরাবর অডিটোরিয়ামে যাওয়া যেত। যারা কনসার্ট বাজাত তারা ঐ

পথ দিয়েই যাতায়াত করত। মাটির প্লাটফরমের কারণ এই—বেঙ্গল থিয়েটারের স্টেজে অনেক নাটকে ঘোড়া বার করা হত। শরৎবাবুর ঘোড়ার সখ ছিল খুব; তিনি খুব ভাল সওয়ার ছিলেন।"

৩ জানুয়ারি ১৮৭২ বেঙ্গল মঞ্চে দুর্গেশনন্দিনীর আবার অভিনয় হয়। বঙ্কিমের নাটক দেখতে সেকালে দারুণ ভীড় জমতো। রঙ্গালয়ে জায়গা পাওয়া যেত না। ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজ ৩ জানুয়ারির অভিনয়ের বিবরণ দিতে গিয়ে লিখেছে—রঙ্গালয় কানায় কানায় ভরে গিয়েছিল। দুশোরও বেশি লোক স্থানাভাবের জন্য টিকিট পায় নি। এই সফল নাট্যাভিনয় আরও কয়েক রজনী প্রদর্শনের জন্য আমরা ম্যানেজারকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

এদিকে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারে বিপুল সমারোহের সঙ্গে মঞ্চস্থ হল বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা—১৮৭৪-এর ৭ এবং ১৪ ফেব্রুয়ারি। উপন্যাসের নাট্যরূপ দিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ। ভারত-সংস্কারক পত্রিকার সমালোচক ২০ ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় এই নাট্যরূপান্তরের প্রশংসা করেন নি। সমালোচকের মতে উপন্যাসের নাট্যরূপ দেওয়া সহজ কাজ নয়। "নাটককার মনে করিয়াছিলেন, উপন্যাসের কেবল কথোপকথন ভাগগুলি নির্বাচন করিয়া লইলেই বুঝি নাটক প্রস্তুত হইল। উপন্যাসে যে সমস্ত কথাবার্তা থাকে, নাটকে তাহা আবশ্যক না হইতে পারে। উপন্যাসকে নাটকরূপে পরিণত করিতে হইলে তাহার কল্পনার উত্তমরূপে পর্যালোচনা করা চাই। পরে কল্পনাকে এমত সকল অঙ্কে এবং গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করিতে হইবে, যাহাতে পাত্র ও পাত্রীগণের চরিত্র, আন্তরিক কার্য ও ভাব তাহাদিগের রিপুদোষ ও হৃদয়ের মহদ্ভাব-সকল এবং পরিশেষে নাট্যকাব্যের সমুদায় কল্পনার বৃহদ্ভাবগুলি অভিনয়-কালে পরিস্ফুতরূপে হৃদ্গত হইতে পারে। এজন্য নাটকে যে সমস্ত দৃশ্য সন্নিবিষ্ট হইবে, উপন্যাসে তাহা না থাকিতে পারে।"[২]

২ বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, "দৃশ্যকাব্য সচরাচর কথোপকথনেই রচিত হয় এবং

২১ এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে নামানো হল বঙ্কিমের আর এক-খানি উপন্যাস—মৃণালিনী। এই উপন্যাসেরও নাট্যরূপ দিলেন গিরিশচন্দ্র। পশুপতির ভূমিকায় অংশগ্রহণ করলেন তিনি। তা ছাড়া বিভিন্ন চরিত্রে রূপদান করলেন অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফী, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমৃতলাল বসু, মতিলাল সুর, মহেন্দ্রলাল বসু প্রমুখ। এই নাটকে কোনো অভিনেত্রী অংশগ্রহণ করেন নি। পুরুষেরাই স্ত্রী-চরিত্রে রূপদান করেন। এই নাট্যাভিনয় খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। কয়েকদিন পর ১৩ মার্চ ১৮৭৪ ভারত সংস্কারক পত্রিকা এই অভিনয় দেখে লেখেন, "মৃণালিনীর প্রতি ব্যোমকেশের আসক্তি ও তন্নিবন্ধন অত্যাচারোদ্যম ও ঘৃণিত ভাবব্যঞ্জক শারীরিক বৈলক্ষণ্য এবং গুরুতর আঘাত নিবন্ধন প্রলাপ ও আর্তনাদ এবং অবশেষে যবন কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া সভয়ে কম্পন ও পতন এবং মৃত্যুকালে আত্মদুষ্কৃতি স্মরণ ও অঙ্গাদি সঞ্চালন প্রভৃতি যাবতীয় ক্রিয়া কোনো রিপুপরতন্ত্র মূর্খ চঞ্চল-মতি ভীরু ভদ্র সন্তানের অনুষ্ঠিত কার্য সকলের ন্যায় অবিকল হইয়াছিল। নদী ও টলটলায়মান নৌকা সংযোগে গিরিজায়া ও মৃণালিনীর গমন, উভয়ের সময়োচিত কথোপকথন ও গিরিজায়া কর্তৃক বসন্তকূজনসদৃশ তানলয় বিশুদ্ধ স্বরসংযোগে সুমধুর সুভাব সংগীত, নদীতীরে পাটনীর গৃহ ও পাটনীর সহিত গিরিজায়ার সখ্যতাসুলভ ভাবব্যঞ্জক কথোপকথন ও সুন্দর সংগীত প্রভৃতি দৃশ্য বিষয়গুলি যুগপৎ বিস্ময়কর ও সাতিশয় প্রীতিপদ হইয়াছিল। উপবন সম্মুখে পশুপতির গৃহ, পশুপতির সহিত মনোরমার অপূর্ব প্রণয় আলাপন ও প্রাসাদোপরি বৃক্ষশাখা অবলম্বনে

রঙ্গাঙ্গনে অভিনীত হইতে পারে, কিন্তু যাহাই কথোপকথনে গ্রন্থিত, এবং অভিনয়োপযোগী, তাহাই যে নাটক বা তচ্ছ্রেণীস্থ, এমত নহে। এ দেশের লোকের সাধারণতঃ উপরোক্ত ভ্রান্তিমূলক সংস্কার আছে। এইজন্য নিত্য দেখা যায় যে, কথোপকথনে গ্রন্থিত অসংখ্য পুস্তক নাটক বলিয়া প্রচারিত, পঠিত এবং অভিনীত হইতেছে। বাস্তবিক তাহার মধ্যে অনেকগুলিই নাটক নহে।"—বঙ্গদর্শন, ১৮৭৩ এপ্রিল।

মনোরমার বৃক্ষারোহণ ও অবরোহণপূর্বক স্বস্থানে প্রস্থান ও শ্মশান সম্মুখে বিকৃতবেশে ও স্থির গম্ভীরভাবে মনোরমার প্রবেশ ও উন্মাদের ন্যায় প্রচণ্ড অগ্নিশিখাতে লম্ফপ্রদান প্রভৃতি দৃশ্য অভিনয়গুলি সাতিশয় বিস্ময়কর ও কৌতুকাবহ হইয়াছিল। উপরিউক্ত দৃশ্য ও শ্রাব্য বিষয়গুলি অতিশয় স্বাভাবিক, উৎকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল সন্দেহ নাই।”

গ্রেট ন্যাশানাল ২৫ জুন ১৮৭৪ বহরমপুরের স্টেশন থিয়েটারে কপালকুণ্ডলা অভিনয় করেন। এই অভিনয় দেখে বঙ্কিমের এক অনুরাগী ভক্ত-পাঠক রীতিমত রেগেমেগে ৫ জুলাই সাধারণী পত্রিকায় এক দীর্ঘ পত্র লেখেন। “এরূপ অভিনয় দেখিতে রাত্রি জাগরণ বৃথা কষ্ট এবং অর্থ ব্যয় করা অপব্যয় ভিন্ন নহে। কপালকুণ্ডলা বাঙ্গালা ভাষার একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। ইহার রচনা প্রণালী এবং গল্পটি আদ্যোপান্ত মধুর ও নির্দোষ কিন্তু নাটকখানি তেমনি কদর্য হইয়াছে, এখানি মুদ্রিত হইলে বঙ্কিমবাবুর কাব্যের অপমান করা হইবেক। প্রথম গঙ্গাসাগর যাত্রা, নবকুমার ও তাহার দুই সঙ্গী এবং দুটি নাবিক দৃষ্ট হইয়া যাত্রার দলের ‘সঙ্’ মনে হইল, তাহারা যে সমুদ্রযাত্রায় বিপদে পড়িয়াছে তাহা তাহাদিগের অভিনয়ে কিছুই বোঝা গেল না। নাবিক-গণের মনের সুখে বিপদের সময় ‘শারিগান’ কখনই স্বাভাবিক নহে। নবকুমারের আদ্যোপান্ত অভিনয় কেবল মুখস্থ মাত্র, তাঁহার মুখে মনের ভাব ব্যক্ত হয় নাই। বঙ্কিমবাবুর আলুলায়িতা কেশা চিরযোগিনী কপালকুণ্ডলাকে দেখিলে মনোমধ্যে শান্তিরসের উদয় হয় কিন্তু অভিনয়ে শীর্ণ জরাজীর্ণ কপালকুণ্ডলাকে দেখিয়া আমাদিগের বৃদ্ধ পিতামহীর গল্পের শঙ্খিনী বা পেত্নী বলিয়া বোধ হইয়াছিল এবং তাঁহার যখন মতিবিবি সৌন্দর্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন তখন আমরা কেহই হাস্য সংবরণ করিতে পারি নাই। কাপালিকের বেশ ভয়ঙ্কর কিছুই হয় নাই কিন্তু তাহার ও মন্দিররক্ষক পুরোহিতের অভিনয় ভাল হইয়াছিল। মতিবিবির অভিনয়ে তাহার গোঁপের চিহ্ন দেখা গিয়াছিল এবং তাহার

স্বর কর্কশ কিন্তু বেশ মন্দ হয় নাই, অন্য সকল অভিনেতার বেশ পুরাতন জরাজীর্ণ। দুটি সংগীত হইয়াছিল তাহা প্রীতিকর নহে, এরূপ গান দুই একটি স্ব-স্ব বন্ধুর নিকট করাই ভাল। প্রকাশ্য নাট্যশালায় ভাল শুনায় না। শেষ অঙ্কে কপালকুণ্ডলার জলে লম্ফ প্রদান স্বাভাবিক হয় নাই। অভিনয় শেষ হইলে আমরা অবাক হইয়া থাকিলাম এবং কি জন্য আমরা অর্থ দিয়া আসিয়াছি তাহা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। ছিন্ন কদর্য চিত্রপট এবং নটগণের অভিনয় তদুপযুক্ত দৃষ্টে কাহার আহ্লাদ বোধ হয় ?"

১৮৭৫-এর মে মাসে কলকাতার মঞ্চে গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটার নামালেন বিষবৃক্ষ আর বেঙ্গল থিয়েটার ওই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে মঞ্চস্থ করলেন কপালকুণ্ডলা।

১৮৭৭ সালের এপ্রিলে বেঙ্গল থিয়েটার বঙ্কিমের তিনখানি বই পর পর মঞ্চস্থ করলেন। ১৬ এপ্রিল মৃণালিনী, ১৮ এপ্রিল কপালকুণ্ডলা ও ২১ এপ্রিল দুর্গেশনন্দিনী। মৃণালিনীতে মৃণালিনী, গিরিজায়া ও মনোরমার ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেন যথাক্রমে বনবিহারিণী, সুকুমারী দত্ত ও বিনোদিনী। বিনোদিনীর অভিনয়-নৈপুণ্য দেখে সকলেই মুগ্ধ হয়েছিলেন। কপালকুণ্ডলায় নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা হন যথাক্রমে হরি বৈষ্ণব ও বিনোদিনী। মতিবিবি ও কাপালিক হন যথাক্রমে সুকুমারী দত্ত ও বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। আর দুর্গেশনন্দিনীতে তখন নেমেছিলেন শরৎচন্দ্র ঘোষ, হরি বৈষ্ণব, বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, সুকুমারী, এলোকেশী, বিনোদিনী ও বনবিহারিণী যথাক্রমে জগৎসিংহ, ওস্‌মান, কত্‌লু খাঁ, বিমলা, আশমানি, আয়েষা ও তিলোত্তমার চরিত্রে ; এই সব নাটকে অসাধারণ অভিনয়ের জন্য সে-সময় বিনোদিনীর খ্যাতি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজি সংবাদপত্র তখন থেকে বিনোদিনীকে 'ফ্লাওয়ার অব দি নেটিভ স্টেজ' বলে উল্লেখ করতে থাকে।

বেঙ্গল থিয়েটারে দুর্গেশনন্দিনী অভিনয় প্রসঙ্গে বিনোদিনী স্মৃতি-কথায় লিখেছেন, "দুর্গেশনন্দিনীতে আয়েষা ও তিলোত্তমা এই দুইটি

ভূমিকা প্রয়োজন হইলে দুইটিই একরাত্রি একসঙ্গে অভিনয় করিয়াছি। কারাগারের ভিতর ব্যতীত আয়েষা ও তিলোত্তমার দেখা নাই! কারাগারে তিলোত্তমার কথাও ছিল না, অন্য একজন তিলোত্তমার কাপড় পরিয়া কারাগারে গিয়া 'কে-ও—বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা?' জগৎসিংহের মুখে এইমাত্র কথা শুনিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িত। আর সেই সময়েই আয়েষার ভূমিকার শ্রেষ্ঠ অংশ ওস্‌মানের সহিত অভিনয়! এই অতি সংকুচিতা ভীরুস্বভাবা রাজকন্যা তিলোত্তমা, তখনি আবার উন্নত-হৃদয়া-গর্বিণী অপরিসীম হৃদয়-বলশালিনী প্রেমপরিপূর্ণা নবাবপুত্রী আয়েষা! এইরূপ দুইভাগে নিজেকে বিভক্ত করিতে কত যে উদ্যম প্রয়োজন তাহা বলিবার নহে। ইহা যে প্রত্যহ ঘটিত তাহা নহে, কার্যকালীন আকস্মিক অভাবে এইরূপে কয়েকবার অভিনয় করিতে হইয়াছিল। একদিন অভিনয় রাত্রিতে আয়েষা সাজিবার জন্য গৃহ হইতে সুন্দর পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া অভিনয় স্থানে উপস্থিত হইয়া শুনিলাম, যিনি আশমানির ভূমিকা অভিনয় করিবেন তিনি উপস্থিত নাই। রঙ্গালয় জনপূর্ণ! কর্তৃপক্ষগণের ভিতর চুপি চুপি কথা হইতেছে—'কে বিনোদকে আশমানির পার্ট অভিনয় করিতে বলিবে? উপস্থিত বিনোদ ব্যতীত অন্য কেহই পারিবে না।' আমি বাটী হইতে একেবারে আয়েষার পোষাকে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছি বলিয়া ভরসা করিয়া কেহই বলিতেছেন না। এমন সময় বাবু অমৃতলাল বসু আসিয়া অতি আদর করিয়া বলিলেন, 'বিনোদ! লক্ষ্মী ভগ্নিটি আমার; আশমানি যে সাজিবে তাহার অসুখ করিয়াছে, তোমায় আজ চালাইয়া দিতে হইবে, নতুবা বড়ই মুস্কিল দেখিতেছি।' যদিও মুখে অনেকবার 'না—পারিব না' বলিয়াছিলাম বটে, আর বাস্তবিক সেই নবাবপুত্রীর সাজ ছাড়িয়া তখন দাসীর পোষাক পরিতে হইবে, আবার আয়েষা সাজিতে অনেক খুঁত হইবে বলিয়া মনে মনে বড় রাগও হইয়াছিল, কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন বুঝিয়া তাঁহাদের কথামত কার্য করিতে বাধ্য হইলাম।"

বেঙ্গলে মৃণালিনী অভিনয় প্রসঙ্গে বিনোদিনী লিখেছেন, "এই

থিয়েটারে বঙ্কিমবাবুর মৃণালিনী অভিনীত হইত। তাহার অভিনয় যেরূপ হইয়াছিল তাহা বর্ণনাতীত। তখনকার বা এখনকার কোনো রঙ্গালয়ে এ পুস্তকের এরূপ অভিনয় বোধ হয় কোথাও হয় নাই।"

বেঙ্গল থিয়েটারে ১৮৭৮-এর ১৬ মার্চ মঞ্চস্থ হল নতুন নাটক চন্দ্রশেখর। নামভূমিকায় নামলেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়। প্রতাপ, ফষ্টর, দলনী ও কুলসমের ভূমিকায় অভিনয় করেন যথাক্রমে হরি বৈষ্ণব, শরৎচন্দ্র ঘোষ, বনবিহারিণী এবং এলোকেশী। ১৮৭৮-এর ৮ জুন এই মঞ্চে পুনরায় দুর্গেশনন্দিনী অভিনীত হয়।

এদিকে গিরিশচন্দ্রের ন্যাশানাল থিয়েটারে নামলো বিষবৃক্ষ। নগেন্দ্র, দেবেন্দ্র, শ্রীশ, সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন যথাক্রমে গিরিশচন্দ্র, রামতারণ সান্যাল, মহেন্দ্রলাল বসু, কাদম্বিনী ও বিনোদিনী। বিনোদিনী তখন বেঙ্গল ছেড়ে ন্যাশানাল থিয়েটারে যোগ দিয়েছেন। বিনোদিনী লিখেছেন, "বিষবৃক্ষে আমি কুন্দের অংশ অভিনয় করিতাম। আমাদের মতন চঞ্চলস্বভাবা স্ত্রীলোকদের মধ্যে সেই ভীরু-স্বভাবা, শান্ত, শিষ্ট, এতটুকু হৃদয় মধ্যে অসীম ভালবাসা লুকাইয়া আত্মীয়স্বজন বর্জিত হইয়া পরগৃহে প্রতিপালিতা হইয়া তাহার উপর দুর্মতি বশতই হউক, আর অদৃষ্ট দোষেই হউক, সেই প্রেমপূর্ণ হৃদয়খানি চুপে চুপে ভয়ে ভয়ে তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ রূপে, গুণে, সহায় সম্পদে, ধনে মানে উচ্চ সেই আশ্রয়দাতাকে দান করিয়া, অতিশয় সহিষ্ণুতার সহিত সেই বেদনাভরা বুকখানিকে, বুকের মধ্যে লুকাইয়া সেই আশ্রয়-দাতাকে আত্মসমর্পণ করিয়া সশঙ্কিত মৃগশিশুর ন্যায় দিন কাটান! উপায় নাই, অবলম্বন নাই, আপনার বলিবার কেহ নাই, আত্মনির্ভরতাও নাই ; এই ভাবে অভিনয় করিতে যে কত ধৈর্য প্রয়োজন, তাহা সমভাবি অভিনেত্রী ব্যতীত অনুভব করিতে পারিবেন না! এই সময় মাননীয় গিরিশবাবু মহাশয় আমার সহিত নগেন্দ্রনাথের অংশ অভিনয় করিতেন।"

ন্যাশানাল থিয়েটার ১৮৭৮-এর ১৬ মার্চ নামালো মৃণালিনী। সাধারণী পত্রিকার ২৪ তারিখের মন্তব্য, "রঙ্গভূমি জনাকীর্ণ হইয়াছিল।

অভিনেতাদিগের মধ্যে পশুপতির অভিনয় অতি উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। ইনি সকল বিষয়েই সমধিক দক্ষতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইঁহার মুখভঙ্গী পরিবর্তন ও নিপুণ অভিনয়কার্যে সকলেই সন্তোষ লাভ করিয়াছিলেন। সাধারণীতে যথার্থ ই লেখা হইয়াছে যে, বঙ্গ নাট্যশালার মধ্যে ইনি একটি শ্রেষ্ঠ রত্ন। হেমচন্দ্রের অভিনয়ও মন্দ হয় নাই, তবে সর্বাঙ্গসুন্দর বলা যায় না। তাহার একমাত্র কারণ অনভ্যাস। মাধবাচার্যের অভিনয় মন্দ হয় নাই। অভিনেত্রীগণের মধ্যে গিরিজায়া ও মনোরমার অভিনয় অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। আমরা মনোরমার চরম দেখিয়া বাস্তবিকই দুঃখিত হইয়াছিলাম। কখনো মনোরমার হৃদয়ে বালিকা উন্মাদিনীর ছায়া, কখনো বা প্রৌঢ়ার ভাবব্যঞ্জক গম্ভীর মূর্তি ধারণের কৃতকার্যতা দর্শনে আনন্দিত হইয়াছিলাম। গিরিজায়া আপনার অংশ অতি উত্তমরূপে সম্পাদিত করিয়াছিলেন। বঙ্গীয় রঙ্গভূমে অভিনেত্রীগণের মধ্যে যে এরূপ প্রত্যাশা করা যাইবে, তাহা আমাদের পূর্বে কখনই বিশ্বাস হয় যাই।"

বিনোদিনীর স্মৃতিকথা থেকে জানা যায়, বঙ্কিম ন্যাশানাল থিয়েটারে মৃণালিনী নাটকখানি দেখেছিলেন এবং বিনোদিনীর অভিনয়-প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন।

মৃণালিনী নাটকে মনোরমা চরিত্রটি অভিনয় প্রসঙ্গে বিনোদিনী লিখেছেন, "মৃণালিনীতে মনোরমার চরিত্রে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলা যে কতদূর কঠিন, তাহা যাঁহারা না মৃণালিনীর অভিনয় দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিবেন না! একসঙ্গে বালিকা, প্রেমময়ী যুবতী, পরামর্শদাত্রী মন্ত্রী, অবশেষে পরম পবিত্র চিত্ত স্বামী সহমরণ অভিলাষিণী দৃঢ়চেতা সতী রমণী! যে কেহ মনোরমার অংশ অভিনয় করিবে, তাহাকেই একসঙ্গে এতগুলি ভাব দর্শককে প্রদর্শন করিতে হইবে! গাম্ভীর্যের সহিত পশুপতির সঙ্গে কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ বালিকামূর্তি ধরিয়া 'পুকুরে হাঁস দেখিগে' বলিয়া চলিয়া যাওয়া যে কত অভ্যাস ও চিন্তাসাধ্য তাহা ধারণা করাই কঠিন। গাম্ভীর্যভাব পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ

অবিকল বালিকাভাব ধারণ যদি স্বাভাবিক না হয় তাহা হইলে দর্শকের নিকট অতি হাস্যজনক হইয়া উঠে; 'ন্যাকাম' বলিয়া অভিনেত্রী উপহাসাস্পদ হন! সেই কারণে ৺বঙ্কিমবাবু মহাশয় নিজে বলিয়াছিলেন যে—আমি মনোরমার চিত্র পুস্তকেই লিখিয়াছিলাম, কখনো যে প্রত্যক্ষ দেখিব এমন আশা করি নাই; আজ বিনোদের অভিনয় দেখিয়া সে ভ্রম ঘুচিল।"

বিনোদিনীর মনোরমা প্রসঙ্গে গিরিশচন্দ্র লেখেন, "অনেক সময়েই আমি বিনোদিনীর সহযোগী অভিনেতা ছিলাম। মৃণালিনীতে আমি পশুপতি সাজিতাম, বিনোদ মনোরমা সাজিত। অন্যান্য অনেক নাটকেই আমরা নায়ক-নায়িকার অংশ গ্রহণ করিয়াছি। সমস্ত বলিতে গেলে অনেক কথা, প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়, কেবল মনোরমার কথাই বলিব। মনোরমার কথা বলিতেছি, তাহার কারণ, আমি প্রতি অভিনয়েই সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমবাবু বর্ণিত সেই বালিকা ও গম্ভীরা মূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এই শিক্ষাদাত্রী তেজস্বিনী সহধর্মিণী আবার পরক্ষণেই 'পশুপতি, তুমি কাঁদছ কেন?' বলিয়াই প্রেমবিহ্বলা বালিকা। হেমচন্দ্রের সহিত কথোপকথন করিতে করিতে এই স্নেহশীলা ভগ্নী, ভ্রাতার মনোবেদনায় সহানুভূতি করিতেছে, আর পরক্ষণেই 'পুকুরে হাঁস দেখিতে যাওয়া' অসাধারণ অভিনয়চাতুর্যে প্রদর্শিত হইত।"

ন্যাশানাল থিয়েটারে ১৬ মার্চের মৃণালিনী দেখে সাধারণী পত্রিকার নাট্যসমালোচক দর্শকদের সম্পর্কে লেখেন, "কতকগুলি দর্শক অভিনেত্রী-গণের প্রতি কুৎসিত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছিলেন, এটি তাহাদিগের অভদ্রতার পরাকাষ্ঠা। ম্যানেজার মহাশয়ের প্রতি আমাদিগের আর একটি বক্তব্য যে, মত্ত ব্যক্তিদিগের রঙ্গভূমে প্রবেশ নিষেধের জন্য যেন বিশেষ যত্ন করা হয়।" এই সব মদমত্তদের প্রতি লক্ষ্য করেই কি বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, "যাঁহার···তীর্থ 'ন্যাশানাল থিয়েটার' তিনিই বাবু।"

বেঙ্গলে ১৮৭৮—এর ৮ জুন নামানো হয়েছিল দুর্গেশনন্দিনী,

গিরিশচন্দ্র ন্যাশানালে দুর্গেশনন্দিনী নামালেন ২২ জুন। কিন্তু এই নাটকে বেঙ্গলের সঙ্গে ন্যাশানাল পাল্লা দিতে পারলো না। ন্যাশানালে জগৎসিংহের ভূমিকায় প্রথমে নেমেছিলেন কেদার চৌধুরী। পরে গিরিশচন্দ্র এই চরিত্রে অবতীর্ণ হন। আয়েষা চরিত্রে অভিনয় করেন বিনোদিনী। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের লেখা থেকে জানা যায়—"দুর্গেশনন্দিনীতে প্রথমত গিরিশচন্দ্র কোনো ভূমিকা লন নাই। কেদারবাবু হইতেন জগৎ। কিরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ওস্‌মান। বেঙ্গল থিয়েটারের অভিনয়ের সহিত এই প্রতিযোগিতা টিঁকিল না। সেখানকার শরৎ ঘোষ মহাশয় ও হরিদাসবাবু উক্ত ভূমিকাদ্বয়ে অপূর্ব অভিনয় করিতেন। দ্বিতীয় রাত্রি হইতে গিরিশচন্দ্রই হইলেন জগৎসিংহ আর ওস্‌মানের ভূমিকা দেওয়া হইল মহেন্দ্র বসুকে। বিনোদিনী হইলেন আয়েষা, কাদম্বিনী বিমলা। অভিনয় হইল অপূর্ব। কিন্তু তথাপি জিৎ রহিল বেঙ্গল থিয়েটারেরই, কারণ শরৎবাবু ঘোড়ায় চড়িয়া রঙ্গমঞ্চে আসিতেন।" ন্যাশানালে জগৎসিংহের ভূমিকায় গিরিশচন্দ্র খুবই উৎকৃষ্ট অভিনয় করেছিলেন। তবুও পরে অনেকের কাছেই তিনি বলেছিলেন—জগৎসিংহের ভূমিকায় শরৎবাবু তাঁর চেয়ে ভালো অভিনয় করেছিলেন।

১৮৮১-র ৩০ মার্চ গিরিশচন্দ্রকে আবার বঙ্কিমের মৃণালিনীতে পশুপতির ভূমিকায় দেখা গেল। মনোরমা ও গিরিজায়ার ভূমিকা গ্রহণ করেন যথাক্রমে বিনোদিনী ও সুকুমারী দত্ত।

এই পর্বে মঞ্চের প্রয়োজনে বঙ্কিমের অনেকগুলি উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন গিরিশচন্দ্র। নাট্যকার গিরিশচন্দ্রের নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এই রূপান্তরিত নাটকগুলির একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বাংলা রঙ্গালয়ের প্রথম পর্বে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি নাট্যরূপ দিয়েছিলেন বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কেদারনাথ চৌধুরী, অতুলকৃষ্ণ মিত্র, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অমৃতলাল বসু প্রমুখ। এই নাটকগুলি এখন একত্রে সংকলিত হওয়া উচিত। বঙ্কিমচন্দ্রের যে-সকল উপন্যাস

গিরিশচন্দ্র নাট্যরূপ দিয়েছেন সেগুলি গিরিশচন্দ্রের রচনাবলীতে সংগৃহীত হয় না কেন? বঙ্কিমচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র—উভয়ের সম্পর্কে চর্চাতেই এই নাট্যরূপগুলির বিশেষ প্রয়োজন আছে।

গিরিশচন্দ্র বঙ্কিমের উপন্যাসের শুধু যে নাট্যরূপই দিয়েছিলেন, তাই নয়, অনেক নাটকে তিনি কোথাও কোথাও নূতন কাহিনীও যোগ করে দিয়েছিলেন। গিরিশচন্দ্র-কৃত মৃণালিনীর নাট্যরূপ থেকে এরকম দুটি ছোট দৃশ্য উদ্ধৃত করে দিচ্ছি। নবদ্বীপ অধিপতি বৃদ্ধ লক্ষ্মণ সেনের ধর্মাধিকার পশুপতির সঙ্গে মুসলমান সেনাপতি বখতিয়ার খিলজির ষড়যন্ত্র হয়েছিল যে, পশুপতি যুদ্ধে নিরস্ত্র থাকলে বখতিয়ার নবদ্বীপ অধিকার করে তাঁকে বঙ্গসিংহাসনে বসাবেন। এইভাবে বখতিয়ার বঙ্গসিংহাসন লাভ করলেও পশুপতির পূর্ব-প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করে তাঁকে বন্দী করেন। এই সময় কারারুদ্ধ পশুপতির মনে আক্ষেপের যে ঝড় ওঠে তারই চিত্র গিরিশচন্দ্র তাঁর নাটকের দুটি দৃশ্যে সংযোজন করেন।

প্রথম দৃশ্য

(৪র্থ অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক)

কারাগারে—পশুপতি

পশুপতি। রাজ্যনাশ—কারাবাস—কর্মদোষে আমার সকলই উপস্থিত। কিন্তু আমি কেমন করে মনোরমাকে বিস্মৃত হব! মনোরমা, তোমার জন্য সব, তোমার কথা না শুনে আমি সব হারালুম। কিন্তু তোমা হারা হয়ে কি পশুপতি জীবনধারণ করতে পারে? কে বলে—পৃথিবী দুঃখময়। পৃথিবীতে এমন কি দুঃখ আছে যে পশুপতিকে পীড়িত করতে পারে? নরক-যন্ত্রণা, উদয় হও! পশুপতির পাপের শাস্তি বিধান কর। নরকে কি এরূপ শাস্তি আছে—পশুপতির উপযুক্ত শাস্তি কি নরকে আছে? আমার অন্তঃকরণ অপেক্ষা কি নরক ভীষণ? শত শত নরক একত্রিত কর—আমার অন্তঃকরণের নিকট তারা পরাস্ত হবে। আত্মীয়-স্বজন-শোণিতে চরণ প্রক্ষালন করেছি—তথাপি কি

পশুপতির হৃদয়ে স্নেহের উদয় হয়? স্নেহ, তুমি বৃক্ষশাখা অবলম্বন কর—পাষাণে বাস কর—পশুপতির হৃদয়ে তোমার স্থান নাই।

(মহম্মদ আলীর প্রবেশ)

মুসলমান, আবার তুমি কি প্রিয় সম্ভাষণ করতে এসেছ? একবার তোমার প্রিয় সম্ভাষণে বিশ্বাস করে এই অবস্থাপন্ন হয়েছি। বিধর্মীকে বিশ্বাস কববাব প্রতিফল পেয়েছি, এখন আমার মৃত্যু সংকল্প—আর তোমাদের কোনো প্রিয় সম্ভাষণ শুনব না।

দ্বি তী য় দৃ শ্য

[পশুপতিকে মুসলমান-পরিচ্ছদ পরিয়ে যখন মহম্মদ আলী ও মুসলমান সৈন্যগণ রাজপথ দিয়ে চলেছে তখন বিকৃত-মস্তিষ্ক পশুপতির উক্তি]

পশুপতি। আকাশ আমার চন্দ্রাতপ! হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—রাজা জন্মেজয়ের মত আমার চন্দ্রাতপ কৃষ্ণবর্ণ হওয়া উচিত। মহাভারত শ্রবণে তাঁর চন্দ্রাতপ শ্বেতবর্ণ হয়েছিল, আমার চন্দ্রাতপ কৃষ্ণবর্ণই থাকবে। শত শত মহাভারত শ্রবণে শ্বেতবর্ণ হবে না।

মহম্মদ আলি। আপনি পাগলের মত কি বলছেন? যা হবার হয়ে গিয়েছে, দুঃখ করলে আর ফিরবে না।

পশুপতি। মন্ত্রীবর, বল দেখি পা রাখি কোথায়? এই দেখ, ভ্রাতৃবর্গের শোণিতাক্ত চরণের ভার মেদিনী আর বহন করতে পাচ্ছে না। মেদিনীরই বা অপরাধ কি? চারি যুগ হতে মনুষ্যের বাস,—এখন বৃদ্ধ হয়েছেন, আর বহন করতে অসমর্থ।

প্রথম সৈন্য। এ কি পাগল হল নাকি?

পশুপতি। লক্ষ্মণসেন, তুমি বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য। তোমাকে পদচ্যুত করায় আমার পাপ নাই। তিরস্কার করবে? কর—সহ্য করব। পশুপতির হৃদয়ে সব সয়—পশুপতির হৃদয়ে অসহ্যও সহ্য হয়।

দ্বিতীয় সৈন্য। হা হতভাগ্য!

পশুপতি। মহারাজ! মহারাজ কে? মহারাজ তো আমি। লক্ষ্মণসেন, তোমার মুখকান্তি মলিন কেন? এতে কি আমার দয়ার উদ্রেক হয়? তোমার ন্যায় শত শত ব্যক্তির ছিন্ন মস্তক পদতলে দলিত করে সিংহাসনে আরোহণ করতে পশুপতির হৃদয় কুণ্ঠিত হয় না। এই দেখ, চরণ দেখ—জানু পর্যন্ত শোণিত দেখ,—রাজপথে দেখে এস—শোণিতস্রোত ভাগীরথীতে গিয়ে পড়ছে।

মহম্মদ। এই দুর্ভাগ্যকে কি করে নিয়ে যাই।

পশুপতি। মন্ত্রীবর ওকে ডাক। লক্ষ্মণসেন, ফের—ফের—উপায় নাই, উপায় থাকলে ফিরতেম। আমার মস্তক দিলে যদি উপায় হয়, এই দণ্ডেই দিতে প্রস্তুত আছি।

মহম্মদ। (স্বগত) কি করি! 'রাজা' বলে সম্বোধন করে দেখি যদি আমার সঙ্গে আসে। (প্রকাশ্যে) মহারাজ, চলুন নৌকা প্রস্তুত।

পশুপতি। কে ডাকে—কাকে ডাকে?

মহম্মদ। আসুন, নৌকা প্রস্তুত।

পশুপতি। মন্ত্রীবর, বিশ্বকর্মা আমার সিংহাসন আনছে। দেখ—দেখ—যম কেমন পুরোহিত, সেই আমার অভিষেক করবে। দেখ—মস্তকশূন্য প্রজাগণ কেমন আহ্লাদে নৃত্য কচ্চে! ছত্রধারী, ছত্র ধর। মনোরমা—মনোরমা—আহা সিংহাসনের বামপার্শ্বে মনোরমা কি অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে!

প্রথম সৈন্য। বোধহয় আমাদের কথা বিশ্বাস কচ্ছে না।

মহম্মদ। (স্বগত) না, আমার কথায় বিশ্বাস করেই এর এই দশা হয়েছে। (প্রকাশ্যে) আমার কথা বিশ্বাস করুন, আপনার প্রাণরক্ষার জন্য নৌকা প্রস্তুত, চলুন।

পশুপতি। বিশ্বাস—কাকে বিশ্বাস? জগতে কে বিশ্বাসের যোগ্য? লক্ষ্মণসেন আমাকে বিশ্বাস করেছিল,—পশুপতি কাকেও বিশ্বাস করে না।

মহম্মদ। মহাশয়, আপনি আপন অবস্থা ভুলে যাচ্ছেন।

পশুপতি। হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ—তুই কে?—মুসলমান। রক্ষক একে বধ কর। হাঃ হাঃ হাঃ—ঐ যে আমার সিংহাসন আসছে,—দেখ দেখ—সিংহাসন আমাকে ডাকছে!

মহম্মদ। (নেপথ্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া) একি! পশুপতির গৃহে কে অগ্নি দিলে? বোধ হয়—সৈন্যেরা লুট করতে করতে অগ্নি দিয়েছে।

পশুপতি। মন্ত্রীবর, প্রজারা এদিকে আসছে কেন? তাদের বল—আজ অভিষেক নয়—অধিবাস। মনোরমা কোথায়? মনোরমা যে আমার সঙ্গে অধিবাস করবে। মনোরমা কোথায় গেল? এঁ্যা, কোথায় গেল? আমার গৃহে আছে। (গমনোদ্যোগ)

মহম্মদ। (পশুপতিকে ধরিয়া) তোমার গৃহ কোথায়? ঐ দেখ, সৈন্যেরা তোমার গৃহে আগুন দিয়েছে।

পশুপতি। (সচকিতে) মনোরমা যে গৃহে আছে। ছাড়—ছাড়—(মহম্মদ আলীর ইঙ্গিতে সৈন্যদ্বয়ের পশুপতির উভয় হস্ত ধারণ)।

মহম্মদ। তুমি বন্দী। তোমাকে কারাগারে নিয়ে যাব।

পশুপতি। এঁ্যা বন্দী! স্থির হও, ছাড়—আমি যাচ্ছি। জীবন স্বপ্নের ন্যায় স্মরণ হচ্ছে। ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও--

মহম্মদ। বোধহয় জ্ঞান হয়েছে।

পশুপতি। (অদূরে স্বীয় ভবন দর্শন করিয়া) ঐ কি আমার গৃহ?

মহম্মদ। হ্যাঁ—তোমার গৃহ।

পশুপতি। হ্যাঁ, আমারই গৃহ বটে। আগুন দিয়েছে (সহসা উন্মত্তাবস্থায়) মনোরমা যে গৃহে আছে, ছাড়—ছাড়—(সবলে হাত ছাড়াইয়া ধাবিত হইলেন)॥

মৃণালিনীতে গিরিশচন্দ্রের লেখা একটি গান উদ্ধৃত করি। গানটি দিগ্বিজয় ও গিরিজায়া পরস্পর মাল্যবিনিময় করে গাইছে—

গি। তুই তুই যা সরে, তোরে মালা দিছি রাগ করে।
দি। তুই মার ধ'রে, কে সরে প্রাণ ধ'রে।
গি। তুই আমার চোখের বালাই,
দি। তোর কাছে কাছে ঘুরি লো তাই,
গি। তোরে আমি দেখতে পারি নে,
দি। ও কথার ধারও ধারি নে,—
ও কথা কানে ধরি নে ;
গি। নে-নে, তুই স'রে যা,—
দি। এই যে—এই যে—তুই বদন তুলে চা ;
গি। কেন রে ছোঁড়া, কেন রে মুখপোড়া,
তুই আসবি কি গায়ের জোরে ?
দি। ও ছুঁড়ি, ও ছুঁড়ি,—
ওলো প্রাণ কাঁদে যে তোর তরে !

কপালকুণ্ডলায় পূজার আসনে কাপালিকের মুখে গিরিশচন্দ্রের রচিত একখানি গান—

বিষমোজ্জ্বল জ্বালা বিভাসিত কপাল,
খলখল করাল হাসিনী।
সদ্যচ্ছেদিত নরমুণ্ড-শোভিত কর,
ঘোর গভীর কাদম্বিনী-বরণী ভীমা ভুবনত্রাসিনী ॥
অতি বিশাল বদনমণ্ডল—
লক্‌লক্ রুধির লোলুপ রসনা.
রুধির ধার-স্রুত বিপুল দশনা,
অস্থি-চর্ম সার, কঙ্কাল হার—
বিভূসিত দিকবসনা ব্যোমগ্রাসিনী ॥
অতি ক্ষীণ কটী-বেষ্টিত নর-কর-কিঙ্কিণী,
মহাকাল কামিনী,
উৎকট আসব-পান-মগনা,

রক্তনয়না শবাসনা বিভীষণা,
নিবিড় মেঘজাল লটপট কেশী, নরমাংসাশী—
ঈশান-মর্দিনী টলটল মেদিনী।
ভয়ঙ্করী ভীষণা শ্মশানবাসিনী॥

গিরিশচন্দ্র বিনোদিনী ও অন্যান্য নটনটীরা ন্যাশানাল থিয়েটার ত্যাগ করে নতুন স্টার থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৮৩ সালে। ফলে ন্যাশানাল থিয়েটারের পূর্ব-মহিমা আর থাকে না। শেষ পর্যন্ত তো ঝাঁপি বন্ধ করে দিতে হয়।

গিরিশ ঘোষের দল ন্যাশানাল থেকে বিদায় নেবার পর ন্যাশানাল বঙ্কিমের বিখ্যাত বই আনন্দমঠ মঞ্চস্থ করেন। এই উপন্যাসের নাট্যরূপ দিয়েছিলেন কেদারনাথ চৌধুরী। এই নাট্যাভিনয়ে কেদারনাথ জীবানন্দের ভূমিকা গ্রহণ করেন। মহেন্দ্রলাল বসু, বনবিহারিণী ও মতিলাল সুর যথাক্রমে মহেন্দ্র, শান্তি ও সত্যানন্দের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই নাটক দর্শকদের সেদিন কিছুমাত্র আনন্দ দিতে পারে নি। নাট্যরূপ, প্রযোজনা ও অভিনয়—কোনো কিছুই উন্নত মানের হয় নি। অভিনয় দেখে সাধারণী পত্রিকা লেখেন, "ন্যাশানাল থিয়েটারের আনন্দমঠ অভিনয়ে কেহই তৃপ্ত হন নাই। একজন পত্রপ্রেরক লিখিয়াছেন—আনন্দমঠ অভিনীত হইল, কিন্তু দেশানুরাগের স্ফুলিঙ্গ-মাত্র আমাদের অন্তরে জ্বলিল না, কিছুমাত্র অশ্রু আমাদের চক্ষে ঝরিল না।" শ্রীশচন্দ্র মজুমদার বঙ্কিমকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে তিনি আনন্দমঠের অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন কি-না। উত্তরে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—গিয়েছিলাম, কিন্তু অভিনয় ভাল হয়নি। শ্রীশচন্দ্র আবার প্রশ্ন করেন—থিয়েটারের উন্নতির জন্য তিনি ম্যানেজারদের উপদেশ পরামর্শ দেন কি-না। বঙ্কিম বলেন—বেশি নয়, আর তা বুঝবে কে?

বঙ্কিমজীবনীকার শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "থিয়েটারের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের চিরদিন অনুরাগ ছিল।...নাটকাভিনয়ে যোগদান না

করিলেও অভিনয়ানুরাগ বঙ্কিমচন্দ্রের চিরদিন ছিল।···প্রৌঢ় ও শেষ বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যে মধ্যে বেঙ্গল প্রভৃতি রঙ্গমঞ্চে অভিনয় দেখিতে যাইতেন। কিন্তু অভিনয়ের সামান্য ত্রুটি হইলেই তিনি বিরক্ত হইয়া উঠিতেন। একবার মৃণালিনী অভিনয়কালে একটা গানের সুর তাঁহার মনোমত হয় নাই, তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিয়াছিলেন। একদা আনন্দমঠের অভিনয় হইতেছিল, শান্তির অভিনয় তাঁহার ভাল লাগে নাই ; তিনি বিরক্তি সহকারে রঙ্গগৃহ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আর একবার দেবী চৌধুরাণীর অভিনয় দেখিয়া বলিয়াছিলেন—আমার পুস্তকখানা মাটি করিয়াছে।”

ন্যাশানালের পুরাতন নট-নটীদের নিয়ে নতুন থিয়েটার এমারেল্ড থিয়েটার খোলা হল। নাট্যকার অতুলকৃষ্ণ মিত্র এমারেল্ডের ম্যানেজারের দায়িত্বভার নিয়ে পর পর বঙ্কিমের কয়েকখানি বই নামালেন। সব-গুলিরই তিনি নিজে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। ১৮৯২-এর জুলাইয়ে বিষবৃক্ষ, আগস্টে মৃণালিনী, সেপ্টেম্বরে কপালকুণ্ডলা এবং ডিসেম্বরে কৃষ্ণকান্তের উইল নামানো হয়েছিল। সে-সময়ে এই নাটকগুলি খুবই সমাদর লাভ করেছিল।

অপরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এমারেল্ড থিয়েটারে কপালকুণ্ডলা দেখেছিলেন। সেই অভিনয়ের বিবরণ পাই তাঁর স্মৃতিকথায়। “এমারেল্ড থিয়েটারে আমরা প্রথম কপালকুণ্ডলার অভিনয় দেখি ; সে অভিনয়ে কপালকুণ্ডলাকে চাপা দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছিল মতিবিবি। তখন মতি-বিবি সাজিতেন স্বর্গীয়া সুকুমারী দত্ত। এই অভিনয়ে যাঁহারা প্রধান প্রধান ভূমিকা লইয়াছিলেন, আমার যতদূর স্মরণ আছে তাহা লিখিতেছি। নবকুমার সাজিয়াছিলেন স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসু। মহেন্দ্রলালের বিশেষত্ব ছিল তাঁহার কণ্ঠস্বর ; দুঃখাত্মক ভূমিকা হতাশ প্রেমিকের ভূমিকা তাঁহার কণ্ঠস্বরে যেমন খাপ খাইত, তেমন আর কাহারো শুনিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই বিশেষত্ব ছিল বলিয়াই তাঁহার নামের তখন বিশেষণ দেওয়া হইল—‘দি ট্রাজেডিয়ান’। কাপালিক

সাজিয়াছিলেন স্বর্গীয় মতিলাল সুর। উগ্র নিষ্ঠুর প্রকৃতির চরিত্রাভিনয়ে ইনি বিশেষ পটু ছিলেন। তাঁহার কাপালিক এখনো রঙ্গমঞ্চে অনুকৃত হয়। মতিবিবির কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সুকুমারী দত্ত একাধারে সুগায়িকা ও সুঅভিনেত্রী ছিলেন। এমারেল্ড থিয়েটারে এই যে কপালকুণ্ডলা ড্রামাটাইজ করা হয়, তাহাতে মতিবিবির চরিত্রে অনেকগুলি গান এইজন্যই সংযোজিত হইয়াছিল। সে গানগুলি এত মনোরম ও প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল যে, এখনো পর্যন্ত সেই গানগুলি লোকের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। এই কপালকুণ্ডলার সময় গানগুলির সুর সংযোগ করিয়াছিলেন সংগীতশাস্ত্রবিশারদ শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্যিক স্বর্গীয় রায় বৈকুণ্ঠনাথ বসু বাহাদুর। কপালকুণ্ডলা—শ্রীমতী হরিমতি (ব্লাকি) পেশমান—স্বর্গীয়া কুসুমকুমারী (হাড়কাটার কুসুম)। এই কুসুমকুমারীও সুগায়িকা ছিলেন বলিয়া পেশমানের ভূমিকায়ও অনেকগুলি গান দেওয়া হয়।”

গিরিশচন্দ্র বলেন, “এক্ষণে যাঁহারা কপালকুণ্ডলার অভিনয় দেখিতে যান তাঁহাদের ধারণা যে, মতিবিবির অংশই নায়িকার অংশ। কিন্তু যাঁহারা বিনোদিনীর অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহাদের নিশ্চয়ই ধারণা যে, কপালকুণ্ডলার নায়িকা কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি নয়। কপালকুণ্ডলার চরিত্র এই যে, বাল্যাবধি স্নেহপালিত না হওয়ায়, নবকুমারের বহু যত্নেও হৃদয়ে প্রেম প্রস্ফুটিত হয় নাই। অবশ্য অন্য স্ত্রীলোকের ন্যায় গৃহকার্য করিত, কিন্তু যখন তাহার ননদিনীর স্বামী বশ করিবার ঔষধের নিমিত্ত বনে প্রবেশ করিল তখন পিঞ্জরাবদ্ধা বিহঙ্গিনী যেরূপ পিঞ্জরমুক্তা হইয়া বনে প্রবেশ মাত্র বন্যবিহঙ্গিনী হইয়া যায়, সেইরূপ গৃহবদ্ধা কপালকুণ্ডলা-অংশ-অভিনয়কারিণী বিনোদিনী বনপ্রবেশ মাত্রেই পূর্বস্মৃতি জাগরিত হইয়া বন্য কপালকুণ্ডলা হইয়া যাইল—এই পরিবর্তন বিনোদিনীর অভিনয়ে অতি সুন্দররূপ প্রস্ফুটিত হইত। তখন কপালকুণ্ডলার অভিনয়ে কপালকুণ্ডলাই নায়িকা ছিল।”

বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও বঙ্গ রঙ্গমঞ্চ বঙ্কিমের আশ্রয় ত্যাগ করে

নি। বেঙ্গল থিয়েটারে বঙ্কিমের তিরোধানের পর ১৮৯৪-এ অভিনীত হয়েছে মৃণালিনী ও বিষবৃক্ষ, ১৮৯৫-এ রজনী ও সীতারাম, ১৮৯৬-এ রাজসিংহ, ১৮৯৭-এ দেবীচৌধুরাণী ও কৃষ্ণকান্তের উইল। ষ্টার থিয়েটারে ১৮৯৪-এ চন্দ্রশেখর, ১৮৯৬-এ রাজসিংহ। ক্লাসিক থিয়েটারে কৃষ্ণ-কান্তের উইল ভ্রমর নামে অভিনীত হয় ১৮৯৯ সালে, ১৯০০-তে সীতারাম। কুড়ি শতকের প্রথমার্ধেও বাংলা রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমের প্রাধান্য ছিল যথেষ্ট।

ক্লাসিক থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ দত্ত বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা মঞ্চস্থ করেছিলেন একবার। থিয়েটারে দর্শকদের আকর্ষণের জন্য অমরেন্দ্রনাথ বিনামূল্যে দর্শকদের নানা উপহার দিতেন এবং আকর্ষণীয় ভাষায় হ্যাণ্ডবিল বিতরণ করতেন। কপালকুণ্ডলার একখানি হ্যাণ্ডবিল এখানে উদ্ধৃত করি—

বঙ্কিমভক্ত আবালবৃদ্ধবনিতার মহা আনন্দের দিন
ক্লাসিক থিয়েটার
৬৮ নং বিডন ষ্ট্রীট
শনিবার ২৫শে জ্যৈষ্ঠ রাত্রি ৯টা
শ্রীযুক্তবাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক সম্পূর্ণ নূতন প্রকরণে
নাটকাকারে পরিবর্তিত
বঙ্কিমচন্দ্রের কপালতিলক
কপালকুণ্ডলা
প্রথম পটোত্তোলনেই গঙ্গাসাগরযাত্রীপূর্ণ নৌকা
ধীরে ধীরে চলিয়াছে।
বান ডাকিল কূলে কূলে জল পরিপূর্ণ হইল।
জলোচ্ছ্বাসে নৌকা বুঝি জলমগ্ন
এ দৃশ্যে চক্ষের পলক পড়িবে না।
ভীষণ ভয়াবহ কালীবাড়ির দৃশ্য।
সমস্ত দৃশ্যপটাবলী নূতন ও মনোবিমোহন।

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবৃত করিতে হইলে স্থান সংকুলান অসম্ভব ;
তবে শেষ দৃশ্যটির কথা না বলিলে নয়।
তরঙ্গায়িত কলকলনাদিনী গঙ্গা উত্তাল তরঙ্গরাশি
ভীমরঙ্গে আতঙ্ক সঞ্চার করিয়া ছুটিয়াছে
সন্দেহবিষজর্জ্জরিত উন্মত্তপ্রায় নবকুমার
কপালকুণ্ডলার সহিত নিমজ্জিত হইল
আর উঠিল না।
কেশ কণ্টকিত হয়! সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুৎলহরী
রঙ্গে ভঙ্গে ছুটিতে থাকে।
উৎকৃষ্ট উপন্যাস
নাটকাকারে কি করিয়া পরিবর্তিত করিতে হয়
দেখিয়া যাও, শিখিয়া যাও।
লোক হাসাইবার জন্য, বালক ভুলাইবার জন্য
নীচ প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দিবার জন্য
কবির মর্যাদাহানি করিয়া অনর্থক চরিত্র
সৃষ্টি হয় নাই,—অকারণ, কুৎসিত
রসপূর্ণ গীতাবলীর অবতারণা করা হয় নাই!
যেখানে যেরূপ প্রয়োজন, তদনুরূপ
আয়োজন হইয়াছে।
সময়োপযোগী সাজসরঞ্জাম অতি সন্তর্পণে
প্রস্তুত হইয়াছে।
সুমধুর রসমাধুরীপূর্ণ সংগীতলহরী !!
এক একখানি গানে—প্রাণের তন্ত্রী
বাজিয়া উঠিবে!
মনোহর—মোহকর—ভাবের লহর !!

সেকালে মঞ্চে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস নামাতে পারা রাতিমত একটা আভিজাত্যের ব্যাপার ছিল। অভিনেতা ও অভিনেত্রীরাও বঙ্কিমের

বইয়ে একবার অভিনয় না করলে যেন জাতে উঠতে পারতেন না। আর সরস্বতীর বরপুত্র বঙ্কিমের বই থিয়েটার কোম্পানি মঞ্চস্থ করলে দেবী-লক্ষ্মীও অপ্রসন্ন হতেন না।

শুধু তাঁর জীবৎকালে বা বিশ শতকের প্রথমার্ধেই মাত্র নয়, এই শতাব্দীর শেষার্ধে এসেও দেখি বাংলা রঙ্গমঞ্চ বঙ্কিমচন্দ্রকে ছাড়েনি। আজও কলকাতার রঙ্গালয়ে বঙ্কিমের আবির্ভাব মাঝে মাঝেই লক্ষ্য করি।

সাগর ও সম্রাট

"আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে নাকি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে?" —বঙ্কিমচন্দ্র

একজন বিদ্যার সাগর, আর একজন সাহিত্যের সম্রাট। উভয়েই উনিশ শতকের বিখ্যাত মনীষী ও লেখক এবং উভয়েই পরস্পরের সমকালীন। বর্ণপরিচয়ের একশো পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা যখন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি জাতির কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করছি—এমন সময় সেই বিদ্যাসাগর সম্পর্কে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের একটি উক্তি হঠাৎ চোখে পড়ে গেল। গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জীবনস্মৃতিতে বঙ্কিম প্রসঙ্গে লিখেছেন, "বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম প্রথম শ্রদ্ধার ভাব ছিল না—তিনি বলিতেন—He is only Primer maker—তিনি খানকতক ছেলেদের পাঠ্যপুস্তক লিখেছেন বই তো নয়।" এখানে প্রশ্ন হল, বঙ্কিমচন্দ্র কি সত্যিই বিদ্যাসাগরের প্রতিভাকে স্বীকার করতেন না? আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন, বঙ্কিমচন্দ্র জীবনের শেষদিকে কি বিদ্যাসাগরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন?

এ-বিষয়ে আমার ধারণা বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র জীবনব্যাপী বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিরূপ-মনোভাব পোষণ করে গিয়েছিলেন।

তৎকালীন নানা সাক্ষ্য—ছড়া ছবি প্রহসন প্রভৃতি থেকে জানা যায় যে বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগর-বিদ্বেষী ছিলেন। কিন্তু স্মৃতিকথা বা ছড়া কার্টুন প্রহসন থেকে যে সংবাদ পাই তা হল সবই অপ্রত্যক্ষ সাক্ষ্য। এই সব অপ্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের গুরুত্ব কেউ স্বীকার করতে পারেন কেউ অস্বীকারও করতে পারেন। আমরা এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের রচনা ও তাঁর স্ব-সম্পাদিত পত্রিকা অবলম্বনে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্যের আলোকে

দেখতে চেষ্টা করব, আজীবন বিদ্যাসাগরের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব কি রকম ছিল।

বঙ্কিম তাঁর সাহিত্যিক জীবনের শুরুতেই—১৮৭১ সালে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রে বেঙ্গলি লিটারেচার শীর্ষক প্রবন্ধে সর্বপ্রথম বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিভা অস্বীকার করেন, এমন কি ঈশ্বর গুপ্তের চেয়েও বিদ্যাসাগরের স্থান নিচুতে বলে মত প্রকাশ করেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি—"He has a great literary reputation so had Iswar Chandra Gupta ; but both reputations are undeserved, and that of Vidyasagar scarcely less so than that of Gupta. If successful translations from other languages constitute any claim to a high place as an author, we admit them in Vidyasagar's case ; and if the compilation of very good primers for infants can in any way strengthen his claim, his claim is strong. But we deny that either translating or primer-making evinces a high order of genius ; and beyond trrnsating and primer-making Vidyasagar has done nothing."

বঙ্কিমচন্দ্র যখন এই কথাগুলি তাঁর প্রবন্ধে লেখেন সে-সময় বিদ্যাসাগরের নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছে—

বেতাল পঞ্চবিংশতি—১৮৪৭, বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ—১৮৪৮, জীবনচরিত—১৮৪৯, বোধোদয় চতুর্থ ভাগ—১৮৫১, সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা—১৮৫১, ঋজুপাঠ—১৮৫১, সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব—১৮৫৩, ব্যাকরণ কৌমুদী—১৮৫৩, শকুন্তলা—১৮৫৪, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি-না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব—১৮৫৫, বর্ণপরিচয়—১৮৫৫, বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি-না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব দ্বিতীয় পুস্তক—১৮৫৫, কথামালা—১৮৫৬, চরিতাবলী—১৮৫৬, মহাভারত—১৮৬০, সীতার বনবাস—১৮৬০, আখ্যানমঞ্জরী—১৮৬৩, শব্দমঞ্জরী—১৮৬৪, ভ্রান্তিবিলাস—১৮৬৯।

যে বছর বঙ্কিমের প্রবন্ধ বেঙ্গলি লিটারেচার ছাপা হয় সে বছরই (১৮৭১) বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি-না এতদ্বিষয়ক বিচার প্রকাশিত হয়।

আমরা জানি বিদ্যাসাগরের বই সে যুগে হাজার হাজার কপি বিক্রি হত। সে যুগের বইয়ের বাজারে বিদ্যাসাগর ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী লেখক। প্রথম কুড়ি বছরের মধ্যে বর্ণপরিচয়ের প্রথম ভাগের ষাট সংস্করণ ছাপা হয়েছিল। ভাবলে বিস্ময়ও লাগে আনন্দও লাগে। কিন্তু সেই কালের উদীয়মান লেখক যিনি, যিনি খ্যাতি ও প্রতিপত্তির আকুলতা নিয়ে সাহিত্যজগতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছেন; সবে তিনখানি মাত্র উপন্যাস বেরিয়েছে—সেই বঙ্কিমচন্দ্র বইয়ের বাজারে বিদ্যাসাগরের অসামান্য পসার দেখে কি কিছুটা ঈর্ষান্বিত হয়েছিলেন?

বিদ্যাসাগরের রচনার সিংহভাগ ১৮৭১ সালের মধ্যেই প্রকাশিত হয়ে গিয়েছিল—এ কথা আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে। এর পর বিদ্যাসাগরের জীবৎকালে তাঁর মাত্র পাঁচখানি বই ছাপা হয়েছিল। সেগুলি হল বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি-না এতদ্বিষয়ক বিচার দ্বিতীয় পুস্তক—১৮৭৩, নিষ্কৃতিলাভপ্রয়াস—১৮৮৮, পদ্যসংগ্রহ—১৮৮৮, সংস্কৃত রচনা—১৮৮৯, শ্লোকমঞ্জরী—১৮৯০।

আমাদের এখানে বক্তব্য হল, বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর যে সকল রচনার জন্য অমর হয়ে রয়েছেন এবং যে অগাধ জ্ঞান ও বৈদগ্ধ্যের জন্য তিনি ঈশ্বরচন্দ্র নন—শুধু মাত্র 'বিদ্যাসাগর' বলেই ১৮৭১ সালের অনেক পূর্বেই সুবিখ্যাত, চারিত্র্য-মাহাত্ম্যে যিনি সেই কালেই প্রবাদপুরুষ—সেই বিদ্যাসাগর মহাশয়কে বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রাইমার মেকার' বলে অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন করলেন; এবং বিদ্যাসাগরকে কোনো ভাবেই উচ্চ প্রতিভার অধিকারী বলা যায় না বলে তীব্র মন্তব্য করলেন। বঙ্কিম চড়া গলায় ঘোষণা করলেন—ট্রানশ্লেসন ছাড়া তো বিদ্যাসাগর মহাশয় সারা জীবনে আর কিছুই করেন নি।

এই বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাসাগর-চরিত প্রবন্ধে

(১৩০২) বললেন, "তাঁহার প্রধান কীর্তি বঙ্গভাষা। বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্যভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্বে বাংলা গদ্যের যে অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষা গঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্প ও সৃষ্টিক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।"

অপরদিকে দেখি গদ্যশিল্পী রূপেও বিদ্যাসাগরকে বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেন নি। তিনি বিদ্যাসাগরের গদ্যকে প্রথমাবধি সংস্কৃতানুসারী বলে নিন্দা করে এসেছেন। ১৮৬১ সালের প্রবন্ধে বঙ্কিমের বক্তব্য—আদর্শ গদ্যের লেখক বিদ্যাসাগরও নন, টেকচাঁদ্ বা হুতোমও নন; গদ্যের আদর্শ শিল্পী হলেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়।

"One of the best masters of a pure and vigorous Bengali style—neither characterized by the somewhat pedantic purity of Vidyasagar, nor rough and homely like Tekchand and Hutam—one of the best masters, we say, of Bengali style is Babu Bhudeb Mukherji."

১৮৭১-এ বঙ্কিম যখন এ-কথা লেখেন তখনও কিন্তু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রধান রচনাগুলি প্রকাশিত হয়নি। প্রকাশিত হয় নি পারিবারিক প্রবন্ধ (১৮৮২), সামাজিক প্রবন্ধ (১৮৯২) বা আচার প্রবন্ধ (১৮৯৫); অথবা পরবর্তী গ্রন্থগুলি। ১৮৭১-এর পূর্বে প্রকাশিত হয়েছে শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব (১৮৫৬), ঐতিহাসিক উপন্যাস (১৮৫৭), প্রাকৃতিক বিজ্ঞান (১৮৫৮), পুরাবৃত্তসার (১৮৫৮), ইংলণ্ডের ইতিহাস (১৮৬১), ক্ষেত্রতত্ত্ব(১৮৬২), রোমের ইতিহাস(১৮৬৩)। এই গ্রন্থগুলির কোনোটিই ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্যপ্রতিভার উৎকৃষ্ট নিদর্শন নয়। এবং এই গ্রন্থগুলির অধিকাংশই তাঁর মৌলিক সৃষ্টিও নয়। এই পর্বের একমাত্র উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস—এটিও রোমান্স অব হিস্টি,

অবলম্বনে রচিত। যেমন বিদ্যাসাগরের ভ্রান্তিবিলাস কমেডি অব এররস অবলম্বনে লিখিত। ১৮৭১-এর পূর্বে প্রকাশিত ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের অনেক আলোচনাই 'নানা ইংরাজি পুস্তক হইতে' সংকলিত। যাই হোক, দেখা যাচ্ছে এই পর্বে বঙ্কিম ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রতিভার প্রশংসা করলেন, তাঁকে আদর্শ গদ্যলেখক রূপে অভিহিত করলেন; অপরদিকে বিদ্যাসাগরকে তীব্র কটু ভাষায় বঙ্কিম সমালোচনা করলেন।

১৮৭২ সালে বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের উদ্দেশে বললেন—তাঁকে "কাব্য রসজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করি না।" এ-কথা বঙ্কিম বলেন তাঁর নিজের সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকার প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (১২৭৯ জ্যৈষ্ঠ) উত্তরচরিত নামক প্রবন্ধে। এটিই বাংলা ভাষায় বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সাহিত্য-সমালোচনা। এবং এই প্রবন্ধে বঙ্কিম ভবভূতির উত্তরচরিত গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে অনাবশ্যক কারণে বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করেছেন এবং তাঁকে "যদুবাবু মাধুবাবু"র সমগোত্রীয় বলে পাঠকের সম্মুখে উপস্থাপিত করেছেন।

বঙ্গদর্শন থেকে উত্তরচরিত প্রবন্ধের প্রথম দুটি অনুচ্ছেদ উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

"ভবভূতি প্রসিদ্ধ কবি, এবং তাঁহার প্রণীত উত্তরচরিত উৎকৃষ্ট নাটক, ইহা অনেকেই শ্রুত আছেন; কিন্তু অল্প লোকেই তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করেন। শকুন্তলার কথা দূরে থাকুক, অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট নাটক রত্নাবলীর প্রতি এতদ্দেশীয় লোকের যেরূপ অনুরাগ, উত্তর-চরিতের প্রতি তাদৃশ নহে। অন্যের কথা দূরে থাকুক, পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, ভবভূতি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, 'কবিত্ব-শক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের পর তদীয় নামনির্দেশ বোধহয় অসঙ্গত বোধ হয় না।' আমরা বিদ্যাসাগর মহাশয়কে অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং লোকহিতৈষী বলিয়া মান্য করি, কিন্তু তাদৃশ কাব্যরসজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করি না, যাহা হউক,

তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির লেখনী হইতে এইরূপ সমালোচনার নিঃসরণ, অস্মদ্দেশে সাধারণতঃ কাব্যরসজ্ঞতার অভাবের চিহ্নস্বরূপ। বিদ্যাসাগরও যদি উত্তরচরিতের মর্যাদা বুঝিতে সমর্থ হইলেন না, তবে যদুবাবু, মাধুবাবু তাহার কি বুঝিবেন?

বাস্তবিক, যত কবি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন, ভবভূতি তাহার মধ্যে একজন প্রধান। বিদ্যাসাগর মহাশয় যে সকল কবিদিগের নাম করিয়াছেন, তন্মধ্যে শকুন্তলার প্রণেতা ভিন্ন আর কেহই ভবভূতির সমকক্ষ হইতে পারেন না। সাগরাপেক্ষা, ঝিল বিল হ্রদের যে রূপ প্রাধান্য, ভবভূতির অপেক্ষা শ্রীহর্ষ এবং বাণভট্টের সেই রূপ প্রাধান্য। পৃথিবীর নাটক প্রণেতৃগণমধ্যে যে শ্রেণীতে সেক্ষপীয়র, এস্কিলস, সফোক্লস্, কাল্‌দেরণ, এবং কালিদাস; ভবভূতি সেই শ্রেণীভুক্ত না হউন, তাঁহাদের নিকটবর্তী বটে।"

বঙ্কিম তাঁর নিবন্ধে বিদ্যাসাগরের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। বিদ্যাসাগর কোথায় এ উক্তি করেছেন তা দেখা যাক।

বঙ্কিমের ভবভূতিচর্চার কুড়ি বছর পূর্বে বিদ্যাসাগর তাঁর সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব গ্রন্থে (১৮৫৩) ভবভূতির আলোচনা করেছিলেন। সেখানে বিদ্যাসাগর ভবভূতি সম্পর্কে কি বলেছিলেন দেখি—

"ভবভূতি একজন অতি প্রধান কবি ছিলেন। কবিত্বশক্তি অনুসারে গণনা করিতে হইলে, কালিদাস, মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষদেব ও বাণভট্টের পর তদীয় নামনির্দেশ, বোধহয়, অসঙ্গত নহে। ভবভূতির রচনা হৃদয়গ্রাহিণী ও অতি চমৎকারিণী। সংস্কৃত ভাষায় যত নাটক আছে, ভবভূতি প্রণীত নাটকত্রয়ের [বীরচরিত, উত্তরচরিত, মালতীমাধব] রচনা সে সকল অপেক্ষা সমধিক প্রগাঢ়। ইনি অন্য অন্য কবিগণের ন্যায় মধুর ও কোমল রচনাতে বিলক্ষণ প্রবীণ ছিলেন; অধিকন্তু, ইঁহার নাটকে মধ্যে মধ্যে অর্থের যেরূপ গাম্ভীর্য দেখিতে পাওয়া যায়, অন্য অন্য কবির নাটকে প্রায় সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না। ভবভূতির বিশেষ

প্রশংসা এই যে, অন্য অন্য কবিরা অনাবশ্যক ও অনুচিত স্থলেও আদিরস অবতীর্ণ করিয়াছেন; ইনি সে বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান; অনাবশ্যক স্থলে কোনও ক্রমেই স্বীয় রচনাকে আদিরসে দূষিত করেন নাই, আবশ্যক স্থলেও অত্যন্ত সাবধান হইয়াছেন।"

বঙ্কিম বিদ্যাসাগর-কৃত এই সমালোচনাকে 'কাব্যরসজ্ঞতার অভাবের চিহ্নস্বরূপ' বলে মনে করেন।

আমাদের বক্তব্য, বঙ্কিম তাঁর প্রবন্ধের সূচনায় বিদ্যাসাগরকে অযথা আক্রমণ করেছেন। বস্তুতপক্ষে, বিদ্যাসাগরের আলোচনা পাঠ করে কোনো পাঠকই স্বীকার করবেন না যে—বিদ্যাসাগর উত্তররচরিতের মর্যাদা বুঝতে সমর্থ হন নি। বিদ্যাসাগর ভবভূতিকে শ্রীহর্ষ বাণভট্টের পর স্থান দিয়েছেন। বঙ্কিম তা মানেন না বলেই বিদ্যাসাগরকে অরসিক বলেছেন। বঙ্কিমের প্রবন্ধের সূচনা অংশ পড়ে মনে হয়—বঙ্কিম তাঁর প্রবন্ধে সম্ভবত একথাই বিচার করতে চাইবেন যে, ভবভূতির স্থান মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের উপরে। কিন্তু বঙ্কিমের প্রবন্ধটি আদ্যোপান্ত পাঠ করলে দেখা যায়—লেখক তাঁর প্রবন্ধে দ্বিতীয়বার আর মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ, বাণভট্টের নামোল্লেখ করেন নি।

বঙ্কিমের উত্তররচরিত প্রবন্ধ বঙ্গদর্শনে পাঁচ সংখ্যায় ধারাবাহিক মুদ্রিত হয়। বঙ্কিম প্রবন্ধের গোড়ায় মনে করেছিলেন, তিনি ভবভূতির কবিত্বের এমন প্রশংসা করবেন যার কাছে বিদ্যাসাগরের সমালোচনা হার মানবে। কিন্তু উত্তররচরিত গ্রন্থখানির ('উত্তররচরিত। বাঙ্গালা অনুবাদ। শ্রীনৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিদ্যারত্ন এম এ, বি এল, কর্তৃক প্রণীত। কলিকাতা, প্রাকৃত-যন্ত্র') ভিতরে প্রবেশ করে বঙ্কিমের পক্ষে তাঁর পূর্ব সংকল্প রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। বস্তুতপক্ষে এই সমালোচনায় বঙ্কিম ভবভূতিকে উচ্চাসনে বসান নি। সেদিক থেকে বঙ্কিম শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের মতামতকেই সম্পূর্ণ অনুসরণ করেছেন —এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যেতে পারে।

বঙ্কিমের মতে, "সৌন্দর্যসৃষ্টি কবির সর্বপ্রধান গুণ—সেই অভিনব,

স্বভাবানুকারী, স্বভাবাতিরিক্ত সৌন্দর্যসৃষ্টি-গুণে, ভারতবর্ষীয় কবিদিগের মধ্যে বাল্মীকি এবং মহাভারতকার প্রধান। এক এক কাব্যে ঈদৃশ সৃষ্টিবৈচিত্র্য প্রায় জগতে দুর্লভ।"

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশ্ন, "এ সম্বন্ধে ভবভূতির স্থান কোথায়?" উত্তরে সমালোচক বলেছেন, "তাহা তাঁহার তিনখানি নাটক পর্যালোচিত না করিলে অবধারিত করা যায় না। তাহা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে। কেবল উত্তরচরিত দেখিয়া তাঁহাকে অতি উচ্চাসন দেওয়া যায় না। উত্তরচরিতে ভবভূতি অনেকদূর পর্যন্ত বাল্মীকির অনুবর্তী হইতে বাধ্য হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার সৃষ্টিমধ্যে নবীনত্বের অভাব এবং সৃষ্টিচাতুর্যের প্রচার করিবার পথও পান নাই। চরিত্র সৃজন সম্বন্ধে ইহা বলা যাইতে পারে যে, রাম ও সীতা ভিন্ন কোন নায়ক নায়িকার প্রাধান্য নাই। সীতা, রামায়ণের সীতার প্রতিকৃতিমাত্র। রামের চরিত্র, রামায়ণের রামের চরিত্রের উৎকৃষ্ট প্রতিকৃতিও নহে—ভবভূতির হস্তে সে মহাচিত্র যে বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্বেই প্রতিপন্ন করা গিয়াছে।"

অর্থাৎ যে সৃষ্টিক্ষমতা বঙ্কিমের মতে কবির প্রধান গুণ সেই সৃষ্টিক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ ভবভূতি উত্তরচরিতে পান নি। তাই কবি হিসাবে ভবভূতিকে বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চ আসন দিতে পারেন নি। এরপরেও কি বঙ্কিমচন্দ্র বলবেন, "পৃথিবীর নাটক প্রণেতৃগণমধ্যে যে শ্রেণীতে সেক্ষপীয়র, এস্কিলস, সফোক্লস, কাল্‌দেরণ, এবং কালিদাস; ভবভূতি সেই শ্রেণীভুক্ত না হউন, তাঁহাদের নিকটবর্তী বটে"; কিংবা "বিদ্যাসাগরও যদি উত্তরচরিতের মর্যাদা বুঝিতে সমর্থ হইলেন না, তবে যদু বাবু মাধু বাবু তাহার কি বুঝিবেন?"

বঙ্কিম পরে বুঝেছিলেন, বিদ্যাসাগরের বিরূপতা করতে গিয়ে তিনি নিজেই হাস্যাস্পদ হয়েছেন। তাঁর বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থে উত্তরচরিত প্রবন্ধটি সংকলন কালে বঙ্কিম প্রবন্ধের সূচনা অংশটি পরিত্যাগ করে নিজের ও নিজের লেখা দুয়েরই মান রক্ষা করেন। অকারণে বিদ্যাসাগরের বিরূপতা করতে গিয়ে বঙ্কিম নিজের লেখাটিকেই মারতে

বলেছিলেন— এ কম দুর্ভাগ্যের কথা নয়। তবে এ কথাও মানতে হবে —জীবনে সৌভাগ্যের সঙ্গে দুর্ভাগ্যও জড়িয়ে থাকে। কোন্ ব্যক্তি পৃথিবীতে শুধুমাত্র সৌভাগ্যের অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে?

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম উত্তরচরিতের প্রথম দুটি অনুচ্ছেদেই যে শুধু বিদ্যাসাগরকে আক্রমণ করেছেন তাই নয়, প্রবন্ধের মধ্যেও মাঝে মাঝেই সুযোগ সৃষ্টি করে বিদ্যাসাগরকে ব্যঙ্গ করেছেন। যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধের সূচনায় ভবভূতিকে সেক্ষপীয়র কালিদাসের নিকটবর্তী বলে উল্লেখ করেছিলেন; সমালোচনার মধ্য পর্বে গিয়ে সেই বঙ্কিম ভবভূতির অক্ষমতার সঙ্গে বিদ্যাসাগর প্রণীত সীতার বনবাস পুস্তকের সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন। বঙ্কিমের মতে ভবভূতির রামচন্দ্র গৌরবে বাল্মীকির রামায়ণের তুল্য নয়; বরং উত্তরচরিতের রাম সীতার বনবাস গ্রন্থে চিত্রিত কাপুরুষ রামচন্দ্রের চরিত্রের অনুরূপ।

"রামায়ণের রাম ক্ষত্রীয়, মহোজ্জ্বলকুলসম্ভূত, মহাতেজস্বী। তিনি পৌরাপবাদ শ্রবণে হৃদ্বিদ্ধ সিংহের ন্যায় রোষে দুঃখে গর্জন করিয়া উঠিলেন। ভবভূতির রামচন্দ্র তৎপরিবর্তে স্ত্রীলোকের মত পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিলেন।...ইহার অনেক গুলিন কথা সকরুণ বটে, কিন্তু ইহা আর্যবীর্যপ্রতিম মহারাজা রামচন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত না হইয়া, আধুনিক কোন বাঙ্গালী বাবুর মুখ হইতে নির্গত হইলে উপযুক্ত হইত। কিন্তু ইহাতেও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মন উঠে নাই। তিনি সীতার বনবাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদে আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন, তাহা পাঠ কালে রামের কান্না পড়িয়া আমাদিগের মনে হইয়াছিল যে, বাঙ্গালীর মেয়েরা স্বামী বা পুত্রকে বিদেশে চাকরি করিতে পাঠাইয়া এইরূপ করিয়া কাঁদে।"

এখানেও বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে সাধারণ পাঠক একমত হবেন না। ভবভূতির রামের বিলাপোক্তির তুলনায় বিদ্যাসাগরের রামের বিলাপোক্তি অনেক সংক্ষিপ্ত ও সংহত। ভবভূতির করুণরসের মত্ত প্রবাহ বিদ্যাসাগর তাঁর গ্রন্থে অনেকখানি সংহত আকারে প্রকাশ করেছেন

—এ কথা বিদ্যাসাগর বিদ্বেষী ছাড়া কেউই অস্বীকার করবেন না। বিদ্যাসাগর তাঁর গ্রন্থে রামের বিলাপোক্তিতে 'আরও কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছেন'—এ কথা সত্য নয়।

বঙ্কিম যখন সম্পাদক ছিলেন তখন বঙ্গদর্শনে অন্য লেখকদের লেখা তিনি নিজের হাতে সংশোধন করে তবে ছাপতে দিতেন।

বঙ্কিমের শেষ বয়সে একদিন 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতির সঙ্গে বঙ্কিমের কথোপকথন হচ্ছিল। সমাজপতি লিখেছেন, "কথায় কথায় ভাষার কথা উঠিল। বঙ্কিমবাবু বলিলেন, 'তোমরা কি ভয়ে লেখকদের লেখা কাটো না? আমি ত বঙ্গদর্শনের অনেক প্রবন্ধ নিজে আবার লিখিয়া দিয়াছি বলিলেও চলে।...এইজন্যই বঙ্গদর্শনের আমলে আমাকে বড় খাটিতে হইত। আমি খুব ভাল করিয়া রিভাইজ না করিয়া কাহারও কাপি প্রেসে দিতাম না।"

বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় অর্থাৎ ১২৮০ (১৮৭৩) বৈশাখ সংখ্যায় তুলনায় সমালোচনা শিরোনামে একটি রচনা ছাপা হয়। এই নিবন্ধে বিদ্যাসাগরকে নূতন পরিকল্পনায় নতুন করে আক্রমণ করা হয়। আমরা জানি এই রচনার লেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকার। কিন্তু লেখক যিনিই হন না কেন লেখাটি যে বঙ্কিম শুভনববর্ষের প্রথম সংখ্যায় যথেষ্ট যত্ন ও উৎসাহ সহকারে ছাপিয়ে ছিলেন তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই। বঙ্কিম বলেছেন—বঙ্গদর্শনে সকলের লেখাতেই তাঁর হাত ছিল। সুতরাং তরুণ অক্ষয়চন্দ্র সরকারের এই লেখায় যে বঙ্কিমের মন ও কলম যুক্ত হয়েছিল—তা মেনে নিতে বাধা নেই।

তুলনায় সমালোচনা প্রবন্ধে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে লেখা হয়েছে, "বিদ্যাসাগর মহাশয় টাকশাল, ও তাঁহার গ্রন্থগুলি দুআনি সিকি আধুলি ও টাঁকা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সাগরী টাঁকশালে রূপা ব্যতীত সোনার সম্পর্ক নাই, টঙ্কযন্ত্রাধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর অন্য স্থানে রূপা

ক্রয় করিয়া নিজে খাদ মিশাইয়া ব্যবসা করিতেছেন। খণ্ড রূপা যেমন একটু পরিষ্কার করিয়া চারিদিকে গোলাকার করিয়া কিরণ দিয়া, উপরে QUEEN VICTORIA ছাপিয়া দিলেই মুদ্রা হয়, সেইরূপ অন্যের রূপা একটু বাঙ্গালা রসান চড়াইয়া, চতুষ্কোণ করিয়া চারিদিকে ছাঁটিয়া উপরে 'শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত' ছাপিয়া দিলেই সাগরিক গ্রন্থ হয়। বর্ণপরিচয় দুআনি ; ক্ষুদ্র, বালকের জন্য প্রয়োজনীয়, শীঘ্র নষ্ট হয় বা হারাইয়া যায়। এইরূপ তাঁহার কোন গ্রন্থ সিকি, কোন গ্রন্থ আধুলি ও কোন গ্রন্থ টাকা। তিনি প্রথমে এক খোট্টা মহাজনের নিকট রূপা লইয়া মুদ্রাযন্ত্র বসান ; সেই খোট্টার রূপায় টাকা প্রস্তুত করান ; সে টাকার নাম 'বেতাল পচিশ' ; সেবার চেম্বরস্ বলে একজন বিলাতী মহাজনের নিকট রূপা লইয়া 'জীবন চরিত' নাম দিয়া, একটু কম খাদ মিশাইয়া ক' হাজার আধুলি প্রস্তুত করাইয়া অনেক লাভ করিলেন। একজন বৃদ্ধ পশ্চিমে পণ্ডিত অধিক পরিমাণে বেশ খাঁটি রূপা রাখিয়া যান ; তাহাই লইয়া আসিয়া আপনার নিজের খাদ কতকগুলা দিয়া তাহাই 'সীতার বনবাস' নামে টাকা করিয়া বিক্রয় করিলেন। এখনও ব্যবসা ছাড়েন নাই, আজি চারি বৎসর হইল সেক্ষপিয়রের 'ধোঁকার মজা' বলে খানিক রূপা ছিল তাহাতেই আপনার সেই মোহর দিয়া 'ভ্রান্তিবিলাস' টাকা নাম দিয়া বিক্রয় করিলেন। এইরূপে উপদেষ্টা প্রতিপন্ন করিলেন যে বিদ্যাসাগর টঙ্কযন্ত্র মাত্র।"

অক্ষয় সরকার নিজেই তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন—বিদ্যাসাগরকে নিয়ে এই 'তুলনা' তাঁর নিজের মাথা থেকে আসে নি। 'এক জ্ঞানী সমালোচক' তাঁকে এই তুলনাটি শুনিয়েছেন। এই 'জ্ঞানী সমালোচক' বা 'উপদেষ্টা'টি কে তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। অন্ধকারেও তাঁকে চেনা যায়।

১৮৭৩ সালে, ১২৮০ আষাঢ় সংখ্যা বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম বহুবিবাহ শিরোনামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধ বিদ্যাসাগর রচিত 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক বিচার—দ্বিতীয়

পুস্তকে'র সমালোচনা। বিদ্যাসাগরের এই গ্রন্থখানি সমালোচনা করতে গিয়ে বঙ্কিম ভাষার দিক থেকে রুচিবোধের সংযমটুকুও আর রক্ষা করেন নি। বঙ্গদর্শন থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি—

"এতদিনের পর যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কোন বিষয়ে ভ্রান্তি দেখি, তবে কথা কহিতে পারি না। চিরকাল অভ্রান্ত কেহ নহে। কিন্তু কোন কোন বিষয় ভ্রান্তির একটু আধিক্য হইয়াছে, বিবেচনা করিতে হয়। এমত হইতে পারে যে, এই ক্ষুদ্র পৃথিবী মধ্যে যে কয়েকজন পণ্ডিত আছেন, তাঁহাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিদ্যাসাগর মহাশয়ই ধর্মশাস্ত্রে বিশারদ। কিন্তু সে কথা পরের মুখেই ভাল শুনায়। বিদ্যাসাগর মহাশয় ততক্ষণ বিলম্ব করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি, শ্রীযুক্ত রাজকুমার ন্যায়রত্ন, শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন, শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী ও শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর কবিরাজ কবিরত্ন তাঁহার প্রতিবাদী। বিদ্যাসাগর মহাশয় একে একে পাঁচ জনকেই বলিয়াছেন যে তাঁহারা ধর্মশাস্ত্রের অনুশীলন করেন নাই। গ্রন্থমধ্যে এই কথা স্থানে স্থানে, নানাবিধ অলঙ্কারবিশিষ্ট হইয়া পুনরুক্ত হইয়াছে। প্রতিবাদী পণ্ডিতেরা এ কথার এই অর্থ করিবেন যে, বিদ্যাসাগর বলিয়াছেন, 'তোমরা কেহ কিছু জান না, ধর্মশাস্ত্রে যাহা কিছু জানি তা আমিই।' আমরা ইহাতে দুঃখিত হইলাম। কেননা আমাদিগের নিতান্ত বাসনা ছিল যে, আমরা ঐ পণ্ডিতদিগকে বলিব যে, 'মহাশয়েরা কোন সাহসে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন? তিনি ধর্মশাস্ত্রে অভ্রান্ত, আপনারা কিছু জানেন না।' আমাদিগের আক্ষেপ এই যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদিগকে সে কথা বলিতে অবকাশ দিলেন না, আপনি সকল কথা বলিয়া রাখিয়াছেন।

ইহা অপেক্ষা আর একটি গুরুতর দোষের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইলাম। প্রাচীন বাঙ্গালীদিগের নিয়ম ছিল, এবং এখনও শ্রেণী বিশেষের লোক ভিন্ন সকল বাঙ্গালীদিগের নিয়ম আছে যে, কোন

বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইলে, বিচারকেরা পরস্পর পূর্বপুরুষের উল্লেখ করিয়া গালি না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিতেন না বা পারেন না। রাম যদি বলিল যে, এটা ঘট, শ্যাম যদি বলিল, না এটা পট, তবে রাম বলিবে, 'শ্যালা তুই কি জানিস'—অমনি শ্যাম তদনুরূপ মধুবৃষ্টি করিবে। বাঙ্গালী লেখক ও বাঙ্গালী অধ্যাপকেরা এক্ষণেও সেই রীতির অনুবর্তী। অধ্যাপকেরা বিদায়ের আশায় সভাস্থ হইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হয়েন, দুই চারি কথার পর পরস্পরকে 'পাষণ্ড' 'ব্যালীক' 'নরাধম' বলিয়া সম্বোধন করেন। বাঙ্গালীর নিম্নশ্রেণীর লেখকেরাও পরস্পরের মতভেদ দেখিলে অমনি ভিন্ন মতাবলম্বীকে 'মূর্খ' 'ধৃষ্ট' 'অসৎ' 'মিথ্যাবাদী' এবং অন্যান্য উচ্চার্য এবং অনুচ্চার্য কথায় অভিহিত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদিগের শিক্ষা ও সংসর্গ বিবেচনা করিয়া তাঁহাদিগের নিকট অন্য ভাষার প্রত্যাশা করা যায় না; ইতরে ইতরের ব্যবহার্য ভাষাই ব্যবহার করিবে। কিন্তু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট আমরা বিচারকালে ভদ্রের ব্যবহার্য ভাষারই প্রত্যাশা করি। ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগর মহাশয় কখনও দূষণীয় ভাষা ব্যবহার করেন নাই—এ সম্বন্ধে তাঁহার রচনা পূর্বাবধি কলঙ্কশূন্য। কিন্তু এই পুস্তকে দেখিলাম যে তিনি আত্মবিস্মৃত হইয়াছেন। সভারূঢ় বিচারমত্ত তৈলোজ্জ্বলললাট বিশিষ্ট নৈয়ায়িকদিগের ন্যায় তিনি প্রতিবাদিগণকে গালি দিয়াছেন। কিন্তু যদি এইরূপ ভাষায় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রীতির এই একটি মাত্র চিহ্ন দেখিতাম, তাহা হইলে মনে করিতাম, দৈবনিগ্রহে এরূপ একবার ঘটিয়াছে। কিন্তু ইদানীন্তন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের উপাসকদিগের মধ্যে এইরূপ ভাষার অতিশয় আধিক্য দেখিতেছি। ইদানীং এইরূপ ভাষাতেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্তব লিখিত ও পঠিত হইয়া থাকে। উপাসকদিগের নিয়ম এই যে যাহাতে উপাস্য দেবতার প্রীতি জন্মে তাহাই তাঁহাকে উপহার দিয়া থাকে—নারায়ণকে তুলসীচন্দন, ঘেঁটুকে ঘেঁটুফুল, ছেঁড়াচুল, এবং গোময়। অতএব যাহা উপাসক নিবেদন করিতেছেন, উপাস্য তাহাই উৎসৃষ্ট করিতেছেন, দেখিয়া যদি কেহ মনে করেন যে উপাস্যের

তাহাতেই আন্তরিক প্রীতি, তবে তিনি মার্জনীয় সন্দেহ নাই। উপাসক সম্প্রদায় আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, আমরা তাঁহাদিগের নিন্দা করিতেছি না। অন্নের দায় ভদ্র লোকেও দাস হয় উপাসক জাতি কোন ছার! কেন তাঁহারা এরূপ আচরণে প্রবৃত্ত তাহা বুঝিয়া কেহই তাঁহাদের অপরাধ লইবে না।”

আর একটি অংশ—

“গালি খাইয়া বিদ্যাসাগর গালি দিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা লিপি-কার্যের সুসভ্য প্রণালী তাদৃশ অবগত নহেন, বিদ্যাসাগর যে তাঁহাদিগের অনুকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, ইহারই জন্য এত কথা বলিলাম। কেবল বঙ্গীয় সাহিত্য হইতে অসভ্যতা কলঙ্ক দূর করিবার প্রয়োজনানুরোধেই, এসকল কথা বলিতে হইল। বহুবিবাহ বিষয়ক দ্বিতীয় পুস্তকে যে ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে ভদ্রসমাজে বিচার চলিতে পারে না। ভদ্র লেখকে বিদ্যাসাগরকে বলিতে পারেন, ‘আপনার সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হইব না। যিনি ভদ্রলোকের ব্যবহার্য ভাষা ব্যবহার না করিয়া কটূক্তি করেন, তাহার সহিত বিচার করিতে ঘৃণা করি’।”

লক্ষ্য করবার বিষয়, বঙ্কিম এই বহুবিবাহ শীর্ষক প্রবন্ধটি দীর্ঘকাল তাঁর কোনো গ্রন্থে সংকলন করেন নি। ১৮৭৬-এ বিবিধ সমালোচন, ১৮৭৯-তে প্রবন্ধ পুস্তক এবং ১৮৮৭-তে বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থের প্রথম ভাগ মুদ্রিত হয়। কিন্তু এই গ্রন্থগুলির কোনোটিতেই বহুবিবাহ সংকলিত হয় নি। শেষে বিদ্যাসাগরের তিরোধানের পরে ১৮৯২ সালে বিবিধ প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে এই প্রবন্ধ সংক্ষেপিত হয়ে সংকলিত হয়।

এখন প্রশ্ন হল, বঙ্কিম ১৮৯২-এর পূর্ব পর্যন্ত এই প্রবন্ধ গ্রন্থভুক্ত করেন নি কেন? বিবিধ প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে বঙ্কিম বলেন, “বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বহুবিবাহ সম্বন্ধীয় দ্বিতীয় পুস্তকের কিছু তীব্র সমালোচনায় আমি কর্তব্যানুরোধে বাধ্য হইয়াছিলাম। তাহাতে তিনি কিছু বিরক্তও হইয়াছিলেন। তাই আমি এ প্রবন্ধ আর পুনর্মুদ্রিত করি নাই।”

সত্যিই কি বিদ্যাসাগর বিরক্ত হয়েছিলেন বলে বঙ্কিম এ প্রবন্ধ বিদ্যাসাগরের জীবৎকালে আর পুনর্মুদ্রিত করেন নি? বিদ্যাসাগর এ প্রবন্ধ পড়ে সত্যিই বিরক্ত হয়েছিলেন কি হন নি—এমন কোনো তথ্য তাঁর জীবনীগ্রন্থ থেকে জানতে পারা যায় না। দ্বিতীয় প্রশ্ন, বিদ্যাসাগর বিরক্ত হলেও বঙ্কিমের এ প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রণে বাধা কোথায় ছিল? একজন মানুষ বিরক্ত হবেন এই আশঙ্কায় কি তিনি কর্তব্যকর্ম থেকে বিরত হলেন? এই যদি সত্যি হয় তবে এটাও কোনো প্রশংসনীয় কাজ নয়। কারণ ব্যক্তিগত বিরক্তি-অনুরক্তির চেয়ে কর্তব্যকর্মকে বড় করে দেখাটাই তো কর্তব্য। বিদ্যাসাগর বিরক্ত হয়েছিলেন এই জন্যই বঙ্কিম এ প্রবন্ধ পুনর্মুদ্রণ থেকে বিরত ছিলেন—এটাই কি দ্বিতীয়বার মুদ্রিত না হওয়ার আসল কারণ? আমি বঙ্কিমের এ-কথা সম্পূর্ণ স্বীকার করি না।

কেন স্বীকার করি না?

বঙ্কিম প্রথমাবধি তাঁর পত্রিকায় বিদ্যাসাগরকে তো কম বিরক্ত করেন নি। তবে বহুবিবাহ পুনর্মুদ্রণে হঠাৎ বৈরাগ্য কেন?

আমার মনে হয় বঙ্কিম বহুবিবাহ প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের প্রতি কটূক্তি করা ছাড়া মূল বিষয়ে যে-কটি কথা বলেছিলেন তার মধ্যে সেদিন বিশেষ কিছু নতুনত্ব বা মৌলিকতা ছিল না। সেই সময় সাময়িকপত্রে এ বিষয়ে অনেক লেখাপত্র বেরিয়েছিল। ১২৭৭-এ (১৮৭১) বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ বিষয়ক প্রথম প্রস্তাবটি বেরলে সোমপ্রকাশ পত্রিকা ১২৭৮-এর ৩০ শ্রাবণ বহুবিবাহ হওয়া উচিত কি না শিরোনামে যে আলোচনাটি প্রকাশ করেন—তা লক্ষ্য করবার মত। সোমপ্রকাশের এই প্রবন্ধে যে সব কথা আছে, দু বছর পরে বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধে মুখ্যত সে-সব কথাই আর একবার কিছু বিস্তারিত করে বলা হয়েছে মাত্র।

সাময়িকপত্রের প্রয়োজনে বঙ্কিম বহুবিবাহ বিষয়ে যা লিখেছিলেন তা তাঁর তৎকালীন কোনো গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়োজন বঙ্কিম

নিজেই অনুভব করেন নি। পত্রপত্রিকার পাতায় সেকালের পাঠক বহুবিবাহ বিষয়ে অনেক কথাই পড়েছিলেন। বঙ্কিম হয়তো অনুভব করেছিলেন তাঁর সাহিত্যবিষয়ক গ্রন্থে পুনশ্চ বহুবিবাহের আলোচনা পাঠকের পক্ষে আকর্ষণযোগ্য হবে না। বঙ্গদর্শনে এ প্রবন্ধ একান্ত যদি কর্তব্যানুরোধেই লিখিত হত, তবে কর্তব্যানুরোধে এ প্রবন্ধ সঙ্গে সঙ্গে পুনর্মুদ্রিতও হত বলে আমি মনে করি।

বঙ্গদর্শনে ১২৮৫ জ্যৈষ্ঠ (১৮৭৮) সংখ্যায় প্রকাশিত বাঙ্গালা ভাষা শীর্ষক প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের গদ্যরীতি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য কি দেখা যাক। এই প্রবন্ধে বঙ্কিম সংস্কৃতানুসারী ভাষা অপেক্ষা টেক-চাঁদি ভাষার প্রশংসা করেছেন। বঙ্কিমের কথা, "এইরূপ সংস্কৃত-প্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন।" বঙ্কিমের মতে রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝতে পারে এবং পড়ামাত্র যার অর্থ বোঝা যায়, অর্থগৌরব থাকলে তাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। "যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদ বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবু-প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে, প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই—নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি, আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে,

অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না। তার পর সেই রচনাকে সৌন্দর্য-বিশিষ্ট করিবে—কেন না, যাহা অসুন্দর, মনুষ্যচিত্তের উপর তাহার শক্তি অল্প। এই উদ্দেশ্যগুলি যাহাতে সরল প্রচলিত ভাষায় সিদ্ধ হয়, সেই চেষ্টা দেখিবে—লেখক যদি লিখিতে জানেন তবে সে চেষ্টা প্রায় সফল হইবে। আমরা দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী।" —এই উদ্ধৃতি থেকে দেখা গেল বঙ্কিম বিদ্যাসাগর ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ভাষাকে এক শ্রেণার অন্তর্গত করে উল্লেখ করেছেন এবং সে ভাষাটি হল সংস্কৃতবহুল ভাষা। আর স্পষ্টত এখানে বলেছেন বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবু প্রদর্শিত ভাষা অপেক্ষা সরল প্রচলিত ভাষা অধিক শক্তিমতী।

এই বঙ্কিম কিন্তু সাত বছর পূর্বে ভূদেব ও বিদ্যাসাগরের ভাষাকে এক শ্রেণীর অন্তর্গত করেননি তাঁর বেঙ্গলি লিটারেচার প্রবন্ধটিতে। সেখানে তিনি বিদ্যাসাগর অপেক্ষা ভূদেবকে উৎকৃষ্ট ভাষাশিল্পী বলে উল্লেখ করেছিলেন।

এখানে একটি প্রশ্ন ওঠে, সত্যিই কি টেকচাঁদি ভাষা বিদ্যাসাগরের ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী? বঙ্কিম এ বিষয়ে যে রায়ই দিন না কেন, কালের বিচারে বিদ্যাসাগর মহাশয় নিজের অনুকূলেই রায় পেয়েছিলেন।

প্যারীচাঁদের মৃত্যুর পরে ১৮৯২ সালে প্রকাশিত লুপ্ত রত্নোদ্ধার গ্রন্থে বঙ্কিম বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান শিরোনামে একটি ভূমিকা লেখেন। এই ভূমিকার এক স্থানে বঙ্কিম বিদ্যাসাগরের গদ্য রীতি প্রসঙ্গে বলেন, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্বে কেহই এরূপ সমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই, এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।" বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি দেখে আমরা সকলেই মনে করে এসেছি, বঙ্কিম বোধ হয় শেষ জীবনে বিদ্যাসাগরের প্রতি বিরূপতা পরিহার করেছিলেন। কারণ এমন অকপট প্রশংসা অমিত্রের পক্ষে সম্ভব নয়। আমাদের প্রশ্ন, বঙ্কিম সত্যিই কি এখানে বিদ্যাসাগরের ভাষার মাহাত্ম্য স্বীকার

করেছেন? আমার তা মনে হয় না।

পূর্ববর্তী বাঙ্গালা ভাষা প্রবন্ধের ন্যায় এখানেও বঙ্কিম ভাষাকে সংস্কৃতানুসারী ও সরল-প্রচলিত-ভাষায় বিভক্ত করেছেন। বঙ্কিমের মতে সেই ভাষাই সর্বোৎকৃষ্ট যে ভাষা সহজে সকলের বোধগম্য হয়। বঙ্কিমের বক্তব্য হল, "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর" হলেও "সর্বজন-বোধগম্য ভাষা হইতে ইহা অনেক দূরে।" এবং "সকল প্রকার কথা এ ভাষায় ব্যবহার হইত না বলিয়া, ইহাতে সকল প্রকার ভাব প্রকাশ করা যাইত না এবং সকল প্রকার রচনা ইহাতে চলিত না। গদ্যে ভাষার ওজস্বিতা এবং বৈচিত্র্যের অভাব হইলে ভাষা উন্নতিশালিনী হয় না।"

এই ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের 'বিষয়' সম্পর্কেও আলোচনা করেছেন। "যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়া মাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ছায়া মাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের সারসংকলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না। বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রতিভাশালী লেখক ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারও শকুন্তলা ও সীতার বনবাস সংস্কৃত হইতে, ভ্রান্তিবিলাস ইংরাজি হইতে এবং বেতাল-পঞ্চবিংশতি হিন্দি হইতে সংগৃহীত।" বঙ্কিমের মতে ভাষা এবং বিষয়-উভয় দিক থেকেই প্যারীচাঁদ বাংলা সাহিত্যকে মুক্তি দিলেন। বঙ্কিমের উক্তি, "তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষের অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন।"

এই সব উক্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়—বঙ্কিম যে বিদ্যাসাগরের ভাষাকে অতি মনোহর বলেছেন তা নিতান্তই তাঁর মৌখিক উক্তি মাত্র। আসলে স্তুতির ছলে তিনি বিদ্যাসাগরের নিন্দাই করেছেন। বঙ্কিম সুদক্ষ লেখক ছিলেন, বিশেষ করে লুপ্ত রত্নোদ্ধারের ভূমিকা যখন লিখছেন তখন তিনি বাংলা সাহিত্যের প্রবীণ পরিণত লেখক। তিনি

কলম চালাতে জানতেন—আবার তিনি আদালতও চালাতেন। লুপ্ত রত্নোদ্ধারের ভূমিকায় বঙ্কিম যে প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরের প্রশংসা করেননি—তা প্রবন্ধটি সতর্কভাবে পড়লেই অনুধাবন করা যায়। বঙ্কিমের মতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কি-গদ্যশিল্পী রূপে কি-গ্রন্থকর্তা রূপে বিদ্যাসাগরের কোনো উচ্চ স্থান নেই।

মাইকেলের মৃত্যুর পর বঙ্কিম মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত শিরোনামে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সুদূর ইংলণ্ডে জন্ স্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যু ঘটলে বঙ্কিম চোখের জল ফেলে বঙ্গদর্শনে দীর্ঘ শোকপ্রস্তাব রচনা করেন, দীনবন্ধু মিত্রের প্রতি প্রীতি ও বন্ধুত্বের নিদর্শন 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী'; ঈশ্বর গুপ্ত, প্যারীচাঁদ বা সঞ্জীবচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধার নিদর্শন যথাক্রমে 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' 'বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারী চাঁদ মিত্রের স্থান' ও 'সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী'। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর তাঁর সম্পর্কে বঙ্কিম কোনো প্রবন্ধ বা শোক-প্রস্তাব রচনার তাগিদ অনুভব করেননি দেখা যাচ্ছে। অথচ দেখি এই বঙ্কিমের তিরোধানের পরেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র শীর্ষক প্রবন্ধে, আর বিদ্যাসাগরের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদিত হয়েছিল বিদ্যাসাগর চরিত নামক সুবিখ্যাত রচনায়।

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পর বঙ্কিম বিদ্যাসাগর সম্পর্কে স্বতন্ত্রভাবে কোনো রচনা লেখেননি; কিন্তু পরিবর্তে একটি কাজ করে গিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের মৃত্যু ১৮৯১-এ, আর বঙ্কিমের বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয় ১৮৯২ সালে। ১৮৭৩ সালে বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম বহুবিবাহ শীর্ষক যে বিদ্যাসাগর-বিরোধী প্রবন্ধটি লেখেন, যে লেখাটি তিনি বিদ্যাসাগরের জীবৎকালে আর পুনর্মুদ্রিত করেননি, যেটি পাঠ করে বিদ্যাসাগর মহাশয় নাকি বিরক্ত হয়েছিলেন বলে বঙ্কিম নিজেই জানিয়েছেন; বিদ্যাসাগরের তিরোধানের পর বঙ্কিমচন্দ্র সেই পুরাতন

প্রবন্ধখানি বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থের মধ্যে সাড়ম্বরে পুনর্মুদ্রিত করলেন। সেই পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধ থেকে কয়েকটা ছত্র উদ্ধৃত করে দিচ্ছি—

"যদি ধর্মশাস্ত্রে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বিশ্বাস ও ভক্তি থাকে, এবং যদি বহুবিবাহ সেই শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস থাকে, তবে তিনি আত্মপক্ষসমর্থনে অধিকারী বটে, এবং তাঁহার পুস্তক, একজন সদনুষ্ঠাতার সদনুষ্ঠানে প্রবৃত্তির প্রমাণস্বরূপ সকলের নিকট আদরণীয়। আর যদি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রে বিশ্বাস ও ভক্তি না থাকে, তবে সেই শাস্ত্রের দোহাই দেওয়া কপটতা মাত্র। যিনি বলিবেন যে, সদনুষ্ঠানের অনুরোধে এইরূপ কপটতা প্রশংসনীয়, আমরা তাঁহাকে বলিব যে সদনুষ্ঠানের উদ্দেশেই হউক বা অসদনুষ্ঠানের উদ্দেশেই হউক, যিনি কপটাচার করেন তাঁহাকে কপটাচারী ভিন্ন আর কিছুই বলিব না। আপনার ক্ষুধানিবারণার্থে যে চুরি করে, সেও যেমন চোর, পরকে বিতরণার্থ যে চুরি করে, সেও তেমনি চোর। বরং দাতা চোরের অপেক্ষা ক্ষুধাতুর চোর মার্জনীয়; কেন না, সে কাতরতাবশতঃ, এবং অলঙ্ঘ্য প্রয়োজনের বশীভূত হইয়া চুরি করিয়াছে। তেমনি যে ব্যক্তি আত্মরক্ষার্থ কপটতা করে, তাহার অপেক্ষা যে নিষ্প্রয়োজনে কপটতা করে, সেই অধিকতর নিন্দনীয়। যিনি এই পাপপূর্ণ, মিথ্যাপরায়ণ মনুষ্যজাতিকে এমত শিক্ষা দেন যে, সদনুষ্ঠানের জন্য প্রতারণা এবং কপটাচারও অবলম্বনীয়, তাঁহাকে আমরা মনুষ্যজাতির পরম শত্রু বিবেচনা করি। তিনি কুশিক্ষার পরম গুরু।"

অপর দিকে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, "যাঁহারা যথার্থ মনুষ্য তাঁহাদের শাস্ত্র তাঁহাদের অন্তরের মধ্যে, অথচ বিশ্বব্যাপী মনুষ্যত্বের সমস্ত নিত্যবিধানগুলির সঙ্গে সে শাস্ত্র আপনি মিলিয়া যায়। অতএব, অন্যান্য প্রতিভায় যেমন 'ওরিজিন্যালিটি' অর্থাৎ অনন্যতন্ত্রতা প্রকাশ পায়, মহচ্চরিত্র বিকাশেও সেইরূপ অনন্যতন্ত্রতার প্রয়োজন হয়। অনেকে বিদ্যাসাগরের অনন্যতন্ত্র প্রতিভা ছিল না বলিয়া আভাস দিয়া থাকেন; তাঁহারা জানেন, অনন্যতন্ত্রত্ব কেবল সাহিত্যে

এবং শিল্পে, বিজ্ঞানে এবং দর্শনেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিদ্যাসাগর এই অকৃতকীর্তি অকিঞ্চিৎকর বঙ্গসমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাংলার ইতিহাসে অতিশয় বিরল।"

রবীন্দ্রনাথের আর একটি উক্তি—

"বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশে একক ছিলেন। এখানে যেন তাঁহার স্বজাতি সোদর কেহ ছিল না। এ দেশে তিনি তাঁহার সমযোগ্য সহযোগীর অভাবে আমৃত্যুকাল নির্বাসন ভোগ করিয়া গিয়াছেন। তিনি সুখী ছিলেন না। তিনি নিজের মধ্যে যে-এক অকৃত্রিম মনুষ্যত্ব সর্বদাই অনুভব করিতেন চারিদিকের জনমণ্ডলীর মধ্যে তাহার আভাস দেখিতে পান নাই। তিনি উপকার করিয়া কৃতঘ্নতা পাইয়াছেন, কার্যকালে সহায়তা প্রাপ্ত হন নাই।"

যে বিদ্যাসাগর এই বঙ্গদেশ থেকে উপকারের পরিবর্তে শুধু কৃতঘ্নতাই পেয়েছিলেন, সেই বিদ্যাসাগর আজ সমগ্র বাঙালীজাতির প্রাতঃস্মরণীয় পুরুষ। বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী বলে আমরা তাঁকে মান্য করি। আজও বাংলার ঘরে ঘরে তাঁর বই পড়েই বাঙালী শিশুসন্তানের বর্ণপরিচয়।

মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র

"কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ শ্রীমধুসূদন।" —বঙ্কিমচন্দ্র

আবির্ভাব কালের হিসাবে মাইকেল মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্র অপেক্ষা চৌদ্দ বৎসরের অগ্রজ। তবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উভয়ে প্রায় সমকালীন। বঙ্কিমের প্রথম গ্রন্থ যদি ললিতা পুরাকালিক গল্প তথা মানস (১৮৫৬ খ্রী) ধরি তবে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব মাইকেলের পূর্বে। কারণ মাইকেলের প্রথম বাংলা পুস্তক শর্মিষ্ঠা নাটক প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে। মধুসূদনের জীবৎকালে প্রকাশিত শেষ পুস্তক হেক্‌টরবধ, প্রকাশকাল সেপ্টেম্বর ১৮৭১; বঙ্কিমের বঙ্গদর্শন তখনও বেরোয়নি, তবে দুর্গেশনন্দিনী কপালকুণ্ডলা বা মৃণালিনী ইতিমধ্যে মুদ্রিত হয়ে গেছে। মধুসূদনের পত্রাবলীতে সমকালীন বহু বিখ্যাত ব্যক্তির নামের উল্লেখ আছে, তাঁদের প্রসঙ্গে মন্তব্য বা আলোচনা আছে; কিন্তু সেই পত্রাবলীর মধ্যে কোথাও বঙ্কিমচন্দ্রের নামোল্লেখ নেই—মধুসূদনের সমগ্র রচনাবলীতেও কোথাও বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বা প্রসঙ্গ খুঁজে পাওয়া যায় না।

মধুসূদনের মৃত্যুর পর বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বঙ্গদর্শনে 'মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত' শিরোনামে সম্পাদকীয় মন্তব্য লেখেন এবং মাইকেলের উদ্দেশে রচিত কবি হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের দুটি দীর্ঘ কবিতা মুদ্রিত করেন।

সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা লিখতে গিয়ে বঙ্কিম যেভাবে ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু, প্যারীচাঁদ বা সঞ্জীবচন্দ্রের জীবন ও সাহিত্যের আলোচনা করেছেন, মধুসূদন সম্পর্কে বঙ্কিমের সে রকম কোনো স্বতন্ত্র আলোচনা নেই। সাধারণভাবে বঙ্কিম রচনাবলী পাঠ করে আমাদের ধারণা হয় মাইকেল সম্বন্ধে বঙ্কিমের বিশেষ কোনো আলোচনা বা মন্তব্য নেই। বস্তুত এ ধারণা সম্পূর্ণ সমূলক নয়। মূল বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বঙ্কিমের

রচনার প্রতি যদি তাকাই, তাহলে সেই পুরাতন ফাইল থেকে মাইকেলের সাহিত্য সম্পর্কে বঙ্কিমের বিবিধ মন্তব্য সংগ্রহ করা যায় এবং সেই পটভূমিতে মাইকেল সম্বন্ধে বঙ্কিমের মনোভাবের একটি স্পষ্ট চিত্র উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

আমরা বঙ্কিম রচনাবলীতে মধুসূদন সম্পর্কে বঙ্কিমের যে একটি মাত্র স্বতন্ত্র রচনা পাই তার শিরোনাম 'মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত'। এই রচনাটি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ সংস্করণের 'বিবিধ' খণ্ডে 'সাময়িকপত্রে মুদ্রিত ও পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত রচনা' পর্যায়ে সংকলিত। কিন্তু এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল—সাময়িকপত্রে মুদ্রিত উক্ত রচনার সম্পূর্ণ পাঠ রচনাবলীতে সংকলিত হয়নি, সম্পাদকদ্বয় (শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস) কর্তৃক বঙ্কিম-রচনার অংশবিশেষ পরিত্যক্ত হয়েছে। কেন পরিত্যক্ত হয়েছে এবং কতটা অংশ বর্জিত হয়েছে ইত্যাদি কোনো নির্দেশ রচনাবলীতে নেই। তাই অদ্যাবধি পাঠকের এই ধারণাই হয়ে এসেছে—রচনাটি অসম্পূর্ণ নয়, সম্পূর্ণ; এবং মূলে যা প্রকাশিত হয়েছিল তা-ই রচনাবলীতে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। বস্তুত মূলে আরও যে কয়েকটি ছত্র ছিল তা রচনাবলীতে সংকলিত হয়নি। কেন হয়নি তার কারণ আমাদের জানা নেই (মধুসূদনের প্রতি অনুরাগ না হেমচন্দ্রের প্রতি বিরাগবশত)। যাই হোক, মূল বঙ্গদর্শন থেকে আমরা সেই পরিত্যক্ত অংশটি উদ্ধৃত করে দিই—

"কিন্তু 'বঙ্গকবি সিংহাসন' শূন্য হয় নাই। এ দুঃখসাগরে সেইটি বাঙ্গালীর সৌভাগ্য নক্ষত্র। মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে, কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক। বঙ্গকবির সিংহাসনে যিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন, তিনি অনন্তধামে যাত্রা করিয়াছেন, কিন্তু হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবিশূন্য বলিয়া আমরা কখন রোদন করিব না।"

এই উক্তির আলোকে মধুসূদন ও হেমচন্দ্র—পরস্পরের সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব কি তা ধারণা করা যায়। লক্ষণীয়, হেমচন্দ্র সম্পর্কে

বঙ্কিম যখন এ কথা বলেন তখনও হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার প্রকাশিত হয়নি। যা প্রকাশিত হয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চিন্তাতরঙ্গিনী, বীরবাহু কাব্য এবং কবিতাবলী। বঙ্কিমচন্দ্র কি এই চিন্তা করেছিলেন যে বাংলা কাব্যসাহিত্যে মধুসূদনের অভাব হেমচন্দ্র পূরণ করবেন? কি কারণে এই চিন্তা বঙ্কিমের মনে দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিল? সিংহাসন কখনো শূন্য থাকে না, রাজার বদলে রাজা আসেন। কিন্তু বঙ্কিম যে-সুরে কথাগুলি বলেছেন তাতে এই ধারণা হয় যে হেমচন্দ্র যোগ্য রাজার যোগ্য উত্তরাধিকারী।

শুধু যোগ্যতার বিচার ছাড়া আরও কি কোনো কারণ আছে? দুই বৎসর পূর্ণ হয়নি, বঙ্গদর্শনের সবে সতেরোটি মাত্র সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদক, হেমচন্দ্র সেই পত্রিকার অন্যতম নিয়মিত লেখক, মধুসূদন নন। এই বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যাতেই হেমচন্দ্রের কবিতা (কামিনী কুসুম) প্রকাশিত হয়েছিল। সেই সংখ্যায় অপর কারও কোনো কবিতা ছিল না। মধুসূদনের মৃত্যুর পূর্বে হেমচন্দ্রের অনেকগুলি কবিতা বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত হয়। মধুসূদনের প্রতি বঙ্কিমের যে কোনো অশ্রদ্ধা ছিল—তা নয়, মাইকেলের কবি-প্রতিভাকে বঙ্কিম বরাবর স্বীকার করেছেন—কবির জীবৎকালে এবং তাঁর মৃত্যুর পরবর্তী সময়েও। তবে এ-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, হেমচন্দ্রের প্রতি বঙ্কিমের বিশেষ অনুরাগ ও আগ্রহ ছিল।

মধুসূদন সম্পর্কে বঙ্কিম সর্বপ্রথম আলোচনা করেন ইংরেজিতে, ১৮৭১ সালে The Calcutta Review পত্রে। Bengali Literature প্রবন্ধে মাইকেল সম্বন্ধে বঙ্কিমের সমালোচনা বেশ দীর্ঘ এবং মূল্যবান। এই নিবন্ধে বঙ্কিম মাইকেলের কবিতা ও নাটক—উভয় রচনাধারা সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন।

সে-যুগে মাইকেলের সাহিত্য নিয়ে সমালোচনার ঝড় ওঠে। কেউ বলেন তিনি কালিদাসের সমগোত্রীয়, আবার কেউ তাঁকে সামান্য কবি ব্যতীত কিছুই বলতে সম্মত নন। বঙ্কিম বলছেন, "আমরা

উভয় শ্রেণীর কোনো সমালোচকের সঙ্গে একমত নই। মধুসূদনের প্রতিভা স্বীকার করলেও তাঁকে আমরা মহাকবিবর্গের আসনে বসাতে সম্মত নই। যদিও তাঁকে বাংলা ভাষায় নবরীতির উদ্ভাবন এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের জন্য কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তথাপি বলা যায় বাংলা সাহিত্যে তাঁর যথার্থ স্থান বোধকরি সর্বোপরি।" বঙ্কিমের বক্তব্যটি হল কালিদাস প্রভৃতির ন্যায় মধুসূদন 'মহাকবি' নন, কিন্তু তিনি অবশ্যই উচ্চ শ্রেণীর কবি, একজন শক্তিশালী কবি।

এই প্রসঙ্গেই তিলোত্তমাসম্ভব ও মেঘনাদবধ কাব্যের কথা আসে। য়ুরোপে যা এপিক এবং ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে যা মহাকাব্য —মধুসূদনের এই দুটি গ্রন্থ সেই মহাকাব্য নামে পরিচিত। তুলনামূলক বিচারে তিলোত্তমা অপেক্ষা মেঘনাদবধ যে শ্রেষ্ঠ, সে-কথা বঙ্কিম নির্দেশ করেছেন।

মেঘনাদবধের মূল কাহিনী রামায়ণ কাব্য থেকে গৃহীত। মধুসূদন বাল্মীকির নিকট বহুভাবে ঋণী, তথাপি তাঁর মৌলিকতা ও বিশিষ্টতা অস্বীকার করবার নয়। বঙ্কিম তাঁর মৌলিকত্বের দিকটিও বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছেন। বঙ্কিমের মতে—দৃশ্যাবলী পাত্র-পাত্রীদের চরিত্র-চিত্রণ, ঘটনাসংস্থান এবং মূল কাহিনীর সঙ্গে যুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনাগুলি অনেকাংশেই মাইকেলের নিজস্ব সৃষ্টি। এগুলির উদ্ভাবন ও ক্রমপরিণতিতে তিনি উচ্চাঙ্গের কলাকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। ঋণের দিক থেকে শুধু যে বাল্মীকির নিকট তা নয়, হোমার বা মিল্টনের কাছেও কবির ঋণ স্বল্প নয়। কিন্তু বঙ্কিম দেখিয়েছেন মধুসূদন অপরের কাছ থেকে যা গ্রহণ করেছেন তা নিতান্তই বাইরের সামগ্রী হয়ে থাকে নি, অধিকাংশ ক্ষেত্রে কবি তাকে আপনার সৃষ্টির সঙ্গে সম্পূর্ণ মিশিয়ে দিতে পেরেছেন।

মেঘনাদবধে বঙ্কিম মধুসূদনের নানা কৃতিত্ব ও দক্ষতার পরিচয় পেয়েছেন। "পাত্রপাত্রীর কল্পনা অতি সুপরিস্ফুট এবং পাঠকের

মনোমুগ্ধকর। ঘটনা পরম্পরা যদিও কোথাও কোথাও অতিপ্রাকৃত, তথাপি তা অত্যন্ত নিপুণ ও সহজভাবে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। রূপকল্পগুলি কোথাও মাধুর্যপূর্ণ, কোথাও করুণ, কোথাও আবার রুদ্ররসাশ্রিত। কল্পনার ক্রীড়া নিত্য পরিবর্তনশীল। ভাষা উচ্চ কবিত্বপূর্ণ এবং শব্দ নির্বাচন এমনই মনোহর যে পরিস্ফুট ভাবগুলির সঙ্গে সঙ্গে তদনুকূল অপর সকল ভাবও অনুক্ষণ অনুরণিত হয়। প্রচলিত সংস্কৃত রীতি অনুসারে কবিতার চরণ সকল স্থলে দুই-দুই পংক্তিতে সমাপ্ত হয়নি ঠিকই কিন্তু মিলটনের কাব্যের ন্যায় যতি বা বিরামের স্থলগুলি ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সন্নিবেশিত হওয়ায় পদগুলি অত্যন্ত সুললিত ও শ্রুতি সুখকর এবং আবেগময় ভাবপ্রকাশের পক্ষে অধিকতর উপযোগী হয়েছে।"

মেঘনাদবধ কাব্যের দোষত্রুটিও বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ্য করেছিলেন। বঙ্কিমের ভাষায়, "শ্রীযুক্ত দত্ত একেবারে ত্রুটিশূন্য নন। যেখানে একটি ফুৎকারেরও প্রয়োজন নেই, সেখানে প্রবল ঝটিকা ভীষণ শব্দে গর্জন করে, যেখানে কোনই আবশ্যকতা নেই সেখানে মেঘের ঘনঘটা এবং অজস্র বৃষ্টিপাতে বন্যার সৃষ্টি। সমুদ্র অনাবশ্যক ক্রোধে স্ফীত হয়ে ভীষণ মূর্তি ধারণ করে, এবং সকলের অনর্থক বিরক্তির কারণ ঘটায়। শ্রীযুক্ত দত্তের মত প্রতিভাবান ও মার্জিত রুচির লেখকের ভাষায় এইরূপ শব্দাড়ম্বর শোভা পায় না। সেইরূপ একই রূপকল্প ও বাগ্‌ভঙ্গীর পুনঃ পুনঃ ব্যবহারও পাঠকের পক্ষে নিতান্ত অস্বস্তিকর। অপরের ভাব আত্মসাৎ করার দায় থেকে তিনি যে সম্পূর্ণ মুক্ত তা নয়। হোমার ও বাল্মীকি থেকে স্থানে স্থানে গ্রহণ করা হয়েছে, মিলটন ও কালিদাস থেকেও তা লক্ষ্য করা যায়। ইংরেজি প্রয়োগ রীতির অনুসরণে স্তম্ভিলা স্বনিলা নির্ঘোষিলা প্রভৃতি ক্রিয়াপদের পুনঃ পুনঃ ব্যবহারের ঘোরতর আপত্তি করি।"

তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যটি বঙ্কিম কর্তৃক তেমনভাবে সমাদৃত হয়নি, কিন্তু বীরাঙ্গনা সমালোচকের আনুকূল্য লাভ করেছে।

বঙ্কিম সেখানে ভাষার চমৎকারিত্ব, অলঙ্কারের সৌন্দর্য, পদের লালিত্য ও শ্রুতিমাধুর্য লক্ষ্য করেছেন। বঙ্কিমের মতে যে বিষয় অবলম্বনে ব্রজাঙ্গনা রচিত তাতে নূতনত্ব সৃষ্টির তেমন অবকাশ কম, আর চতুর্দশপদী কবিতাবলী সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য কাব্যমধ্যে ভাবের ঐক্যবদ্ধতা নেই।

নাট্যকার হিসাবে মাইকেলের সাফল্য বঙ্কিম স্বীকার করেন নি। শর্মিষ্ঠা পদ্মাবতী কৃষ্ণকুমারী—কোনোটিই উচ্চ মর্যাদা লাভের অধিকারী বলে সমালোচক মনে করেন না। বরং প্রহসন রচয়িতা হিসেবে বঙ্কিম মাইকেলের কৃতিত্ব স্বীকার করতে প্রস্তুত ; এবং একেই কি বলে সভ্যতা গ্রন্থটিকে বাংলা ভাষায় লেখা শ্রেষ্ঠ প্রহসন বলে উল্লেখ করেন।

Bengali Literature প্রবন্ধটির পর বঙ্কিমের রচনায় মধুসূদনের উল্লেখ পাই অবকাশরঞ্জিনী গ্রন্থের সমালোনায়। বঙ্গদর্শনে এই সমালোচনার প্রকাশকাল ১২৮০ বৈশাখ (১৮৭৩ খ্রী)। গীতিকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম একস্থলে বলছেন, "বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের রচনা, ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মাইকেল মধুসূদন দত্তের ব্রজাঙ্গনা কাব্য, হেমবাবুর কবিতাবলী, ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য। অবকাশরঞ্জিনী আর একখানি উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য।"

বৈশাখে অবকাশরঞ্জিনী, পরের জ্যৈষ্ঠে প্রকাশিত হল রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রণীত দানবদলন কাব্যের সমালোচনা। দানবদলন অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি, "তিনি শ্রীযুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্তের প্রদর্শিত প্রথানুসারে অমিত্রাক্ষর ছন্দে আদ্যকাব্য রচনা করিয়াছেন। এই ছন্দঃ বীররসপ্রধান রচনার উপযোগী। এই ছন্দঃ রামচন্দ্রবাবুর সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হয় নাই, কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ বলিয়া যে সকল পদ্য প্রত্যহ সাধারণ সমীপে প্রেরিত হয়, তদপেক্ষা সর্বাংশে উৎকৃষ্ট।"

অতঃপর বঙ্কিমের যে রচনায় মধুসূদনের প্রসঙ্গ আছে সেটি দীনেশ-

চরণ বসুর লেখা মানসবিকাশ কাব্যের সমালোচনা। বঙ্গদর্শনে এই সমালোচনা নিবন্ধটি প্রকাশিত হয় ১২৮০ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যায়। এই সমালোচনার প্রথমাংশ 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' শিরোনামে বিবিধ প্রবন্ধ গ্রন্থে সংকলিত হয়। বিদ্যাপতি ও জয়দেব প্রবন্ধের শেষ যেখানে, তারপর বঙ্গদর্শনে যে দীর্ঘ আলোচনা অবশিষ্ট সেখানে মধুসূদন প্রসঙ্গের উল্লেখ দেখতে পাই।

বঙ্কিম বলছেন, "ভারতচন্দ্রাদি বাঙ্গালী কবি, যাঁহারা কালিদাস ও জয়দেবকে আদর্শ করেন, তাঁহাদের কাব্য ইন্দ্রিয়পর। কোনো মূর্খ না মনে করেন যে, ইহাতে কালিদাসাদির কবিত্বের নিন্দা হইতেছে— কেবল কাব্যের শ্রেণী নির্বাচন হইতেছে মাত্র। আধুনিক, ইংরেজি কাব্যের অনুকারী বাঙ্গালী কবিগণ, কিয়দংশে আধ্যাত্মিকতা দোষে দুষ্ট। মধুসূদন, যেরূপে ইংরেজি কবিদিগের শিষ্য, সেইরূপে কতকদূর জয়দেবাদির শিষ্য, এই জন্য তাঁহাতে আধ্যাত্মিকতা দোষ তাদৃশ স্পষ্ট নহে। হেমচন্দ্র নিজের প্রতিভা শক্তির গুণে নূতন পথ খনন করিতেছেন, তাঁহার আধ্যাত্মিকতা দোষ অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট কিন্তু অবকাশরঞ্জিনীর লেখক এবং মানসবিকাশ লেখকের এ দোষ বিলক্ষণ প্রবল।"

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিম হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার কাব্যটির সমালোচনা করেন ১২৮১ বঙ্গাব্দের মাঘ-ফাল্গুন সংখ্যায় (১৮৭৫ খ্রী)। এখানে বঙ্কিম অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সমালোচনার উপসংহারে বঙ্কিমের উক্তি, "গ্রন্থকারের ছন্দঃ সম্বন্ধে আমাদিগের কিছু বলা হয় নাই। ইউরোপে এ বিষয়ে একটি কুপ্রথা আছে। একটি ছন্দে এক একখানি বৃহৎ মহাকাব্য লিখিত হইয়া থাকে। ইহা পাঠকমাত্রেরই শ্রান্তিকর বোধ হয়। কতক কতক এই কারণে ইউরোপীয় মহাকাব্যসকল সামান্য পাঠকেরা আদ্যোপান্ত পড়িয়া উঠিতে পারে না। এদেশীয় প্রাচীন প্রথাটি ভাল—সর্গে সর্গে ছন্দঃ পরিবর্তন হয়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত দেশীপ্রথা পরিত্যাগ করিয়া ইউরোপীয় প্রথা অবলম্বন করিয়া স্বপ্রণীত কাব্যসকলের কিঞ্চিৎ

হানি করিয়াছিলেন। হেমবাবু দেশী প্রথাটিই বজায় রাখিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার বৈচিত্র্য ও লালিত্য বৃদ্ধি হইয়াছে।"

রবীন্দ্রনাথ পঞ্চদশবৎসর বয়সে মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা করেছিলেন। মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়সে কিছুটা প্রভাবিত হন।

বঙ্কিমচন্দ্রের অপর কয়েকটি রচনাতেও মধুসূদন প্রসঙ্গ আছে। দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী ও কবিত্ব প্রবন্ধে বঙ্কিম নীলদর্পণ নাটকের ইংরেজি অনুবাদ প্রসঙ্গে লিখেছেন, "ইহার ইংরেজি অনুবাদ করিয়া মাইকেল মধুসূদন দত্ত গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি শেষে তাঁহার জীবননির্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকুরি পর্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।"

সম্প্রতি অবশ্য প্রশ্ন উঠেছে, নীলদর্পণের ইংরেজি অনুবাদক মধুসূদন না অপর কেউ?

দীনবন্ধুর কবিত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমের বক্তব্য, "সেই ১৮৫৯-৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়—উহা নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরানো দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ।"

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতাসংগ্রহের ভূমিকায় বঙ্কিমের উক্তি, "মধুসূদন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি, ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালীর কবি।"

এই প্রবন্ধে ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যে অলঙ্কারের আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিম মাইকেলের কথা উল্লেখ করেছেন। মধুসূদনের প্রশংসা করে বঙ্কিম বলেছেন, "মধুসূদন দত্ত মধ্যে মধ্যে অনুপ্রাসের ব্যবহার করেন, —বড় বুঝিয়া সুঝিয়া, রাখিয়া ঢাকিয়া ব্যবহার করেন—মধুর হয়।"

সামগ্রিক বিচারে মধুসূদনের সাহিত্য সৃষ্টির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের যে যথেষ্ট শ্রদ্ধানুরাগ ছিল তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। কবি হেমচন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা যে-পরিমাণ ছিল,

মধুসূদনের সঙ্গে বঙ্কিমের সম্পর্ক অবশ্যই তদ্রূপ ছিল না। হেমচন্দ্রের প্রতি বঙ্কিমের অনুরাগ সর্বদাই ক্রিয়াশীল ছিল। সেজন্য বঙ্কিমকে সেযুগে বিরূপ সমালোচনাও শুনতে হয়েছিল। কিন্তু মধুসূদনকে বঙ্কিম সর্বদাই নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করেছিলেন ; সে বিচারে ব্যক্তিগত অনুরাগের অনাবশ্যক আনুকূল্য ছিল না।

সেই মধুসূদনের মৃত্যুতে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি, "জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ শ্রীমধুসূদন।"

এ মন্তব্য যথার্থ, এ উক্তির মধ্যে কোনো আতিশয্য নেই, কৃত্রিমতার সামান্য লক্ষণও এখানে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত।

ঠাকুরবাড়ি ও বঙ্কিম

"বঙ্কিমবাবুর অসাধারণ নাক। এই নাকে, সুরুচি, অভিনিবেশ, মানব-চরিত্র-জ্ঞান ও অসাধারণ উদ্যম প্রকাশ পায়। তাঁহার এজ্‌লাসি কাজ সত্ত্বেও, উপর্যুপরি এত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যে তিনি লিখিতে পারিয়াছেন—সে কেবল তাঁর নাকের জোরে।" —জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির মানুষগুলির সঙ্গে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমের আলাপ পরিচয় ঘনিষ্ঠতা বন্ধুত্ব বিরোধ ও বিতর্কের ইতিহাস যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমনই চিত্তাকর্ষক। আমরা কিছু পরিমাণে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের ইতিহাস জানি। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ছাড়াও ঠাকুরবাড়ির অনেকের সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ প্রীতি অনুরাগ শ্রদ্ধা ভালোবাসা ও মৈত্রী ছিল। যখন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমের আলাপ হয়নি তার আগেই বঙ্কিমচন্দ্র এসেছিলেন ছয় নম্বর দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলিতে। শুধু গলি পর্যন্ত নয়, উঠেছিলেন ঠাকুরবাড়ির তেতলার ছাদেও। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা পড়তেন, দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধুত্ব ছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বঙ্কিমকে সামনে বসিয়ে এঁকেছিলেন বঙ্কিমের অসামান্য পোর্ট্রেট, রবীন্দ্রনাথের নতুন বউঠান কাদম্বরী দেবী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের একান্ত অনুরাগী পাঠিকা, জ্ঞানদানন্দিনী তাঁর পত্রিকায় বঙ্কিমকে বিশেষভাবে সম্মানিত করেছিলেন—বাংলা সাময়িকপত্রে তিনিই প্রথম ছাপিয়েছিলেন বঙ্কিমের প্রতিকৃতি, সুধীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের উপর লিখেছিলেন একাধিক আর্টিকেল, লিখেছিলেন বলেন্দ্রনাথও, স্বর্ণকুমারী প্রায়ই যেতেন বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ি, সরলা দেবী বঙ্কিমচন্দ্রের অন্ধ ভক্ত ছিলেন, দ্বিজেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ থেকে সরলা দেবী পর্যন্ত সকলের সঙ্গেই বঙ্কিমের চিঠিপত্র চলত, বঙ্কিম সরলা দেবীকে নিজের এক সেট বই উপহার দিয়েছিলেন আর সরলা দেবীরা দিয়েছিলেন বঙ্কিমের প্রিয় এক পেটি দামী দার্জিলিং চা—সঙ্গে সুগন্ধি একগুচ্ছ গোলাপ। বঙ্কিমের যেদিন অকস্মাৎ মৃত্যুসংবাদ এল, বিংশোত্তীর্ণা স্বর্ণকন্যার

সেদিন তীব্র ভাবে মনে হয়েছিল—তাঁর নিজের জীবন থেকেই বুঝি একাংশ খসে গেল।

ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের যোগ বঙ্গদর্শন পত্রিকার সূত্রেই। জোড়াসাঁকোয় বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন নিয়মিত আসত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন "বঙ্গদর্শন এলে পাড়ায় দুপুরবেলায় কারো ঘুম থাকত না। আমার সুবিধে ছিল, কাড়াকাড়ি করবার দরকার হত না—কেননা আমার একটা গুণ ছিল—আমি ভালো পড়ে শোনাতে পারতুম। আপন মনে পড়ার চেয়ে আমার পড়া শুনতে বউঠাকরুণ ভালোবাসতেন। তখন বিজলিপাখা ছিল না, পড়তে পড়তে বউঠাকরুণের হাতপাখার হাওয়ার একটা ভাগ আমি আদায় করে নিতুম।" বউঠানের সান্নিধ্যে এবং তাঁর হাতপাখার মলয় বাতাস গায়ে লাগিয়ে কেমন করে তাঁরা মাসিক বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বঙ্কিমের বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর প্রভৃতি ধারাবাহিক উপন্যাস "মাসের পর মাস কামনা করিয়া অপেক্ষা করিয়া অল্পকালের পড়াকে সুদীর্ঘকালের অবকাশের দ্বারা মনের মধ্যে অনুরণিত করিয়া তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি ভোগের সঙ্গে কৌতূহলকে অনেক দিন ধরিয়া গাঁথিয়া গাঁথিয়া" পড়তেন—তার বিবরণ রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে পাই।

অথচ এই বঙ্গদর্শনে ঠিক সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথের জ্যোতিদাদা—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম নাট্যগ্রন্থ কিঞ্চিৎ জলযোগ কিংবা দ্বিতীয় নাট্যগ্রন্থ পুরুবিক্রম নাটক কিভাবে সমালোচিত হয়েছিল, বঙ্কিম ভালো বলেছিলেন না মন্দ বলেছিলেন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে সেই সমালোচনা কিরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, কবি-বউঠান কাদম্বরী দেবী তাঁর স্বামীর প্রথম বা দ্বিতীয় পুস্তকের সমালোচনা দেখে কতখানি পুলকিত বা উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন—ইত্যাদি কোনো সংবাদ রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে আমরা পাই না।

মনে রাখা প্রয়োজন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম গ্রন্থ কিঞ্চিৎ জলযোগ (২০ সেপ্টেম্বর ১৮৭২) বা দ্বিতীয় গ্রন্থ পুরুবিক্রম নাটক

(৯ জুলাই ১৮৭৪) যখন প্রকাশিত হয় তখনো দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বপ্ন-প্রয়াণ (১৮অক্টোবর ১৮৭৫) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি। এই পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গদর্শনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের গ্রন্থের বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত সমালোচনা ঠাকুর পরিবারের সাহিত্যের ইতিহাসে খুব একটা গুরুত্ব-পূর্ণ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। অথচ রবীন্দ্রনাথের মনে এই রকম একটি ঘটনা সেদিন বিশেষ কোনো দাগ কাটেনি দেখতে পাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দুটি বই-ই সেদিন নাট্যকারের নাম ছাড়াই ছাপা হয়েছিল। তাই বঙ্গদর্শনের সমালোচনাতেও দেখি গ্রন্থের নামের সঙ্গে গ্রন্থকারের নামটি নেই। সমালোচনাতে নাট্যকারের নামোল্লেখ না থাকলেও কিঞ্চিৎ জলযোগ বা পুরুবিক্রম নাটক যে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের লেখা—তা নিশ্চয় কাদম্বরী দেবী বা রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞাত ছিল না।

বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষেই (১২৭৯ চৈত্র, ১৮৭৩ খ্রী) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশিত হয়। বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় বর্ষের চতুর্থ সংখ্যায় (১২৮০ শ্রাবণ, ১৮৭৩ খ্রী) প্রকাশিত হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের প্রথম সর্গ। পরে সমগ্র কাব্যটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৭৫ সালের ১৮ অক্টোবর। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় (পুরাতন প্রসঙ্গ) বঙ্গদর্শনে স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য প্রকাশের উল্লেখ করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের উক্তি, "আমি যখন প্রথম স্বপ্নপ্রয়াণ রচনা করিতে আরম্ভ করি, তাহার কোনও কোনও অংশ বঙ্কিমবাবুকে পাঠাইয়াছিলাম, তাঁহার বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করিবার জন্য। তখনকার স্বপ্নপ্রয়াণ আর এখনকার স্বপ্নপ্রয়াণে অনেক তফাৎ। আমার পুস্তকে কতকগুলো কাল্পনিক ছবির সমাবেশ ছিল। বঙ্কিমবাবু বোধ হয় সেগুলো ছাপান নাই, এক-আধটা ছাপাইয়াছিলেন কি না আমার স্মরণ নাই। কিন্তু তাঁহার বিষবৃক্ষের মধ্যে ঠিক সেই রকম ছবির অবতারণা করিয়া বসিলেন। তফাতের মধ্যে দাঁড়াইল এই যে, যাহা স্বপ্নে অশোভন

হয় না, তাহা বাস্তব জগতে, গৃহস্থচিত্রে, বিশেষত হিন্দু গৃহস্থচিত্রে অত্যন্ত অশোভন হইয়া দাঁড়াইল। নগেন্দ্রনাথের ঘরের মধ্যে সেই রকম ছবি থাকিতে পারে; কিন্তু বাড়ির মধ্যে গৃহস্থ বধূ গাড়ি হাঁকাইলেন, এ চিত্র একেবারেই সুশোভন হইল না। কিন্তু এই রকম চিত্র সমাবেশের আইডিয়াটা যে তিনি আমার রচনা হইতে পাইতে ছিলেন, সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।" সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিনা মন্তব্যে স্বপ্নপ্রয়াণ প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের এই উক্তি পুরাতন প্রসঙ্গ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ফলে বাংলা সাহিত্যের পাঠকসমাজ দ্বিজেন্দ্রনাথের কথানুসারে এযাবৎ এই ধারণাই পোষণ করে এসেছেন যে বিষবৃক্ষে স্তিমিত প্রদীপে শীর্ষক চুয়াল্লিশ সংখ্যক পরিচ্ছেদটি স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্যের আইডিয়া অবলম্বনে রচিত। দ্বিজেন্দ্রনাথ যা বলেছেন তার মূল অর্থ হল বিষবৃক্ষের ওই পরিচ্ছেদের ছবি বঙ্কিম স্বপ্নপ্রয়াণ থেকে হরণ করেছেন। কথাটার সত্যাসত্য বিচার করা দরকার।

দ্বিজেন্দ্রনাথের কথা অনুসরণে আমরা নয় মেনে নিলাম যে বিষবৃক্ষ ও স্বপ্নপ্রয়াণের মধ্যে চিত্রধর্মিতায় কিছু মিল আছে। নয় মেনে নিলাম একজনের দ্বারা আর একজন প্রভাবিত হয়েছিলেন। কিন্তু কার দ্বারা কে প্রভাবিত হয়েছিলেন? দ্বিজেন্দ্রনাথের দ্বারা বঙ্কিম না বঙ্কিমের দ্বারা দ্বিজেন্দ্রনাথ? দেখা যাক—সাময়িকপত্রে কার রচনা কবে প্রকাশিত হয়েছে।

পূর্বে বলেছি স্বপ্নপ্রয়াণ প্রকাশিত হয় ১২৮০ শ্রাবণে। অপর দিকে বিষবৃক্ষের প্রকাশ হয় ১২৭৯ বৈশাখ (১২৮২ খ্রী) আর শেষ হয় ওই বছর ফাল্গুনে (১৮৭৩ খ্রী)। অর্থাৎ বঙ্গদর্শনে স্বপ্নপ্রয়াণ প্রকাশের পাঁচ মাস আগেই বিষবৃক্ষ উপন্যাস সমাপ্ত হয়। আর বিষবৃক্ষের চুয়াল্লিশ পরিচ্ছেদটি স্তিমিত প্রদীপে বঙ্গদর্শনে মুদ্রিত হয় ১২৭৯ মাঘ (১৮৭৩ খ্রী) সংখ্যায়। অর্থাৎ স্বপ্নপ্রয়াণ প্রকাশের ছয় মাস পূর্বে। স্তিমিত প্রদীপে পরিচ্ছেদটি মাঘ মাসে মুদ্রিত হয়েছিল—এর

অর্থ, বঙ্কিম এই অংশটি লিখে ফেলেছিলেন অন্তত কার্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে, কিংবা ধরা যাক পৌষ মাসেই। তা হলেও দাঁড়ায়—স্বপ্নপ্রয়াণ প্রকাশের দীর্ঘ সাত মাস পূর্বে। এই অবস্থায় কখনই কেউ স্বীকার করতে পারেন না যে স্বপ্নপ্রয়াণের দ্বারা বিষবৃক্ষ প্রভাবিত হয়েছিল।

দ্বিজেন্দ্রনাথের উক্তি সমর্থন করে কেউ হয়তো বলতে পারেন—বঙ্গদর্শনে স্বপ্নপ্রয়াণ যবেই ছাপা হোক না কেন কবি তাঁর কবিতা সম্পাদকের কাছে পাঠিয়েছিলেন তার অনেক পূর্বে, বঙ্গদর্শনে স্তিমিত প্রদীপে পরিচ্ছেদটি প্রকাশেরও পূর্বে। অর্থাৎ স্বপ্নপ্রয়াণ মুদ্রিত হবার সাত-আট মাস পূর্বে। দ্বিজেন্দ্র-পক্ষাবলম্বীরা বলতে পারেন—বঙ্কিম দ্বিজেন্দ্রনাথের পাণ্ডুলিপি থেকেই চিত্রগুলি সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন। এই কথার উত্তরে বঙ্কিম পক্ষের সমর্থক বলবেন—বঙ্কিম যদি কোনো পাণ্ডুলিপি থেকে কিছু "অপহরণ" করেই থাকেন তবে তিনি নিজে কখনো তাঁর নিজের পত্রিকার পাতায় সেই পাণ্ডুলিপি পুনরায় ছাপতে পারেন না। নিজের অপরাধের সূত্র নিজে থেকে কি কেউ কখনো চোখের সামনে দেখিয়ে দেয়? দ্বিতীয় কথা, ধরে নেওয়া গেল যে দ্বিজেন্দ্রনাথ ১২৭৯ মাঘের আগেই পাণ্ডুলিপি বঙ্কিমকে দিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, দ্বিজেন্দ্রনাথ যখন দেখলেন বঙ্গদর্শনের মাঘ সংখ্যায় বঙ্কিম বিষবৃক্ষের মধ্যে তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণের কাল্পনিক চিত্রগুলির মত "ছবির অবতারণা করিয়া বসিলেন" তখন দ্বিজেন্দ্রনাথ বঙ্কিমের সেই অমার্জনীয় অপরাধ নীরবে মেনে নিলেন কেমন করে? তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেও তো একটা প্রতিবাদ-পত্র প্রকাশিত হতে পারত। কিন্তু তেমন কোনো প্রতিবাদ সেদিনের কোনো কাগজে প্রকাশিত হয়নি। সব চেয়ে বড় কথা হল—বঙ্কিম যদি স্বপ্নপ্রয়াণের চিত্র-সমাবেশের আইডিয়াটা বিষবৃক্ষের মধ্যে সত্যিই চালিয়ে থাকেন, তা হলে এই ঘটনার পরেও দ্বিজেন্দ্রনাথ কি করে তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ছাপার অনুমতি দিলেন? কিন্তু দেখা যাচ্ছে, দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর স্বপ্নপ্রয়াণ কাব্য বঙ্গদর্শন থেকে তুলে নেননি। ১২৮০ শ্রাবণের

বঙ্গদর্শনে স্বপ্নপ্রয়াণ ছাপা হল।

দ্বিজেন্দ্রনাথ যে বলেছেন, "এই রকম চিত্রসমাবেশের আইডিয়াটা যে তিনি আমার রচনা হইতে পাইতেছিলেন সে বিষয়ে আমার কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।"—একথা কোনো দিক থেকেই প্রমাণ করা যায় না। বরং ইতিহাস ও তথ্য-প্রমাণ একথাই বলবে যে উভয় রচনার মধ্যে সত্যিই যদি কোনো ভাবগত মিল থেকে থাকে তবে দ্বিজেন্দ্রনাথই চিত্রসমাবেশের আইডিয়াটা বঙ্কিমের কাছ থেকে পেয়েছিলেন। কারণ বিষবৃক্ষের অনেক পরে স্বপ্নপ্রয়াণ প্রকাশিত হয়।

বঙ্গদর্শনের যে সংখ্যায় স্বপ্নপ্রয়াণ ছাপা হয় তার ঠিক এক বছর পর, ১২৮১ ভাদ্র (১৮৭৪ খ্রী) সংখ্যার বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হল জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দ্বিতীয় গ্রন্থ পুরুবিক্রম নাটকের সমালোচনা। কিঞ্চিৎ জলযোগের মত এটিও যে বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত সমালোচনা—তা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নিজের উক্তি থেকেই জানা যায়।

কিঞ্চিৎ জলযোগের সমালোচনায় বঙ্কিম গ্রন্থকারকে বিশেষ প্রশংসা করেছিলেন। পুরুবিক্রম নাটকের সমালোচনায় বঙ্কিম নাট্যকার সম্পর্কে বললেন, "এইরূপ কৃতবিদ্য এবং মার্জ্জিতরুচি মহাশয়গণ নাটক প্রণয়নের ভার গ্রহণ করেন, ইহা নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। তাহা হইলে, নিতান্ত পক্ষে বাঙ্গালা নাটকের বর্তমান অশ্লীলতা এবং কদর্যতা থাকিবে না।"

রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমকে প্রথম দেখেন ১২৮২ বঙ্গাব্দে—১৮৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে, রাজা শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের এমারেল্ড বাওয়ারে দ্বিতীয় কলেজ রিইউনিয়ন নামক মিলন সভায়। তখন বঙ্গদর্শনের চতুর্থ বর্ষের পৌষ সংখ্যা সবে বেরিয়েছে। শেষ হয়েছে রজনী, শুরু হয়েছে নতুন উপন্যাস কৃষ্ণকান্তের উইল। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "সেই সম্মিলন সভার ভিড়ের মধ্যে ঘুরিতে ঘুরিতে নানা লোকের মধ্যে হঠাৎ এমন একজনকে দেখিলাম যিনি সকলের হইতে স্বতন্ত্র—যাঁহাকে অন্য পাঁচ জনের সঙ্গে মিশাইয়া ফেলিবার জো নাই। সেই গৌরকান্তি

দীর্ঘকায় পুরুষের মুখের মধ্যে এমন একটি দৃপ্ত তেজ দেখিলাম যে, তাঁহার পরিচয় জানিবার কৌতূহল সম্বরণ করিতে পারিলাম না। সেদিনকার এত লোকের মধ্যে, কেবলমাত্র, তিনি কে ইহাই জানিবার জন্য প্রশ্ন করিয়াছিলাম। যখন শুনিলাম তিনিই বঙ্কিমবাবু, তখন বড়ো বিস্ময় জন্মিল। লেখা পড়িয়া এতদিন যাঁহাকে মহৎ বলিয়া জানিতাম চেহারাতেও তাঁহার বিশিষ্টতার যে এমন একটি নিশ্চিত পরিচয় আছে সেকথা সেদিন আমার মনে খুব লাগিয়াছিল। বঙ্কিমবাবুর খড়্গনাসায়, তাঁহার চাপা ঠোঁটে, তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভারি একটা প্রবলতার লক্ষণ ছিল। বক্ষের উপর দুই হাত বদ্ধ করিয়া তিনি যেন সকলের নিকট হইতে পৃথক হইয়া চলিতেছিলেন, কাহারও সঙ্গে যেন তাঁর কিছুমাত্র গা-ঘেঁষাঘেঁষি ছিল না, এইটেই সর্বাপেক্ষা বেশি করিয়া আমার চোখে ঠেকিয়াছিল। তাঁহার যে কেবলমাত্র বুদ্ধিশালী মননশীল লেখকের ভাব তাহা নহে, তাঁহার ললাটে যেন একটি অদৃশ্য রাজতিলক পরানো ছিল।"

এই ১২৮২র শেষে চৈত্র সংখ্যার (১৮৭৬ মার্চ) পর বঙ্গদর্শনের প্রকাশ অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে গেল।

বঙ্গদর্শনের জন্ম এবং মৃত্যুই ঠাকুরবাড়ির ভারতী পত্রিকার আবির্ভাবের মুখ্য কারণ। ১২৮৩-তে (১৮৭৬ খ্রী) বঙ্গদর্শন বেরলো না। সেই সময় ঠাকুরবাড়ির সাহিত্যিকরা বঙ্গদেশের জন্য একটি সাহিত্য পত্রিকার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে অনুভব করলেন। প্রকাশিত হল নতুন কাগজ ভারতী। প্রথম সংখ্যা বেরলো ১২৮৪ শ্রাবণ (১৮৭৭ খ্রী) মাসে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে এই মাসিক পত্রিকাটির প্রবর্তন হল। সম্পাদক হলেন স্বপ্নপ্রয়াণের কবি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। দ্বিজেন্দ্রনাথ তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন, "জ্যোতির ঝোঁক হইল, একখানা নূতন-পত্র বাহির করিতে হইবে। আমার কিন্তু ততটা ইচ্ছা ছিল না। আমার ইচ্ছা ছিল, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে ভাল করিয়া জাঁকাইয়া তোলা যাক। কিন্তু জ্যোতির চেষ্টায়

ভারতী প্রকাশিত হইল। বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের মত একখানা কাগজ করিতে হইবে এই ছিল জ্যোতির ইচ্ছা। আমাকে সম্পাদক হইতে বলিল। আমি আপত্তি করিলাম না। আমি কিন্তু ঐ নামটুকু দিয়াই খালাস। কাগজের সমস্ত ভার জ্যোতির উপর পড়িল।"

বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বইয়ের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল ; এবার ঠাকুরবাড়ির পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের বইয়ের সমালোচনা প্রকাশিত হল। ভারতীতে বঙ্কিমের কবিতাপুস্তক নামক গ্রন্থের অতি দীর্ঘ সমালোচনা বেরলো ১২৮৫ ভাদ্র (১৮৭৮ খ্রী) সংখ্যায়। রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই বেনামী সমালোচনাটি রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে মনে করেছেন ('রবীন্দ্রনাথের বাল্য রচনা : কালানুক্রমিক সূচী' রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা প্রথম খণ্ড)। কিন্তু সত্যিই এটি রবীন্দ্রনাথের লেখা কি না—তা জোর করে আমরা বলতে পারি না। কারণ আমাদের হাতে, এটি রবীন্দ্রনাথের লেখা বলে প্রমাণ করবার মত কোনো প্রত্যক্ষ তথ্য নেই। আমাদের বক্তব্য, এটি রবীন্দ্রনাথের লেখা হতেও পারে, নাও হতে পারে। কিন্তু এটি যে রবীন্দ্রনাথেরই লেখা—এমন কথা নিশ্চয় করে বলার মত কোনো অবকাশ নেই।

ভারতী পত্রিকার সমালোচনার উপসংহার অংশটি উদ্ধৃত করি—

"উপসংহারকালে আমরা একটি মাত্র কথা বলিব—বঙ্কিমবাবু উপন্যাস লিখিয়া যতদূর প্রতিষ্ঠাবান হইয়াছেন, এই নিকৃষ্ট কবিতাখানির প্রভাবে তাঁহার সে যশ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না। আমরা বিলক্ষণ জানি যে, ভাল একজন উপন্যাস লেখক ভাল কবি হইতে পারেন না। স্যার ওয়ালটর স্কটের কবিতাগুলি পর্যন্ত প্রধান প্রধান সমালোচকদের মতে ছন্দগ্রথিত উপন্যাসমাত্র। কিন্তু তাহা না হইলেও সকল ব্যক্তিতে স্যার ওয়ালটর স্কটের প্রতিভা সম্ভাবিত নহে। কবি ও উপন্যাস লেখক ভিন্ন উপাদানে নির্মিত, তাঁহাদের অন্তর্দৃষ্টি ও বহির্দৃষ্টি ভিন্নভাবে বিক্ষিপ্ত হয়, একজন কেবল ঘটনাগুলি এমন করিয়া সাজাইতে চাহেন যে

তাহাতে উদ্দেশ্য সাধন হইতে পারে—অপরজন ঘটনার প্রতি ঈষৎমাত্র দৃষ্টি রাখিয়া কেবল ভাবের বিকাশের দিকেই লক্ষ্য স্থির রাখেন। স্কটের লেডি অফ দি লেকের সহিত বাইরনের জওয়ারের তুলনা করিয়া দেখিলে আমাদের কথার সার্থকতা সপ্রমাণ হইবে।"

জোড়াসাঁকোর বাড়িতে বঙ্কিমের প্রথম আবির্ভাবের সংবাদ পাই "বিদ্বজ্জনসমাগম" সভা উপলক্ষে। বছরে একবার দেশের সমস্ত সাহিত্যিককে একত্র করবার অভিপ্রায়ে ঠাকুরবাড়িতে বিদ্বজ্জনসমাগম নামে এক সভা স্থাপিত হয়েছিল। সেই সম্মিলন উপলক্ষে গান-বাজনা আবৃত্তি ও আহারাদি হত।

এই সম্মিলনের দ্বিতীয়বারের সভায় বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থিত হয়েছিলেন। সম্মিলনের প্রথম বৎসরের অধিবেশন হয় ১২৮১ বঙ্গাব্দে (১৮৭৪ খ্রী)। সেবারের সভায় বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থিত ছিলেন না। দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মিলন আহূত হয় ১৬ ফাল্গুন শনিবার ১২৮৭ (১৮৮১ খ্রী)। এই সভায় রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি-প্রতিভা অভিনীত হয়। বাল্মীকি-প্রতিভা বই প্রকাশিত হয় ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১ (২ মাঘ ১২৮৭)। রবীন্দ্রনাথ নিজে বাল্মীকির ভূমিকায় অভিনয় করেন। এই সভার বিবরণ ছাপা হয় ১৭ ফাল্গুন ১২৮৭-র (২৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৮১) সাধারণী পত্রে। পত্রিকা লিখেছে—

"কল্য শনিবার সন্ধ্যার পর কলিকাতার জোড়াসাঁকোস্থ শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভবনে 'বিদ্বজ্জনসমাগম' হইয়াছিল। ডাক্তার কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু প্যারীমোহন মিত্র, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বাবু নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, বাবু শীতলপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, মিষ্টার বি এল গুপ্ত, মিষ্টার টি এন পালিত, আচার্য শ্রীক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, রাজা শ্রীশৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, ডাক্তার কানাইলাল দে, পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, বাবু কৃষ্ণবিহারী সেন প্রভৃতি বহুতর আহূত ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুরবাড়ির ছোট ছোট গুটিকত বালক বালিকা সঙ্গীত-যন্ত্রের সুরের সঙ্গে বেশ সুস্বরে গান করিয়াছিলেন।

তাহার পর বাল্মীকি প্রতিভা নামে একখানি অভিনব গীতিকাব্য অভিনীত হয়। বাল্মীকি সরস্বতী-কৃপায় দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া কিরূপে অমর কবিত্ব লাভ করেন তাহা প্রদর্শন করাই এই কাব্যের উদ্দেশ্য। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বয়ং বাল্মীকি হন আর 'প্রতিভা' নাম্নী প্রতিভাসম্পন্না তাঁহার দ্বাদশবর্ষীয়া ভ্রাতুষ্কন্যা বাগ্‌দেবী রূপে অভিনয় করেন।"

রবীন্দ্রনাথ এই অভিনয় প্রসঙ্গে লিখেছেন, "তেতালার ছাদের উপর পাল খাটাইয়া স্টেজ বাঁধিয়া বাল্মীকি প্রতিভার অভিনয় হইল। আমি সাজিয়াছিলাম বাল্মীকি। আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী প্রতিভা সরস্বতী সাজিয়াছিল। বাল্মীকি প্রতিভার নামের মধ্যে সেই ইতিহাসটুকু রহিয়াছে। দর্শকদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন—অভিনয়মঞ্চ হইতে আমি তাঁহাকে চক্ষে দেখিতে পাইলাম না কিন্তু শুনিতে পাইলাম তিনি খুসি হইয়া গিয়াছিলেন।"

বিদ্বজ্জনসমাগম অনুষ্ঠানের পরেই রবীন্দ্রনাথ কোনো সময়ে (১৮৮১ ফেব্রুয়ারি—সেপ্টেম্বর, ১২৮৭ মাঘ—১২৮৮ ভাদ্র) 'সাহস' সঞ্চয় করে বঙ্কিমচন্দ্রের বাসায় তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু নবীন রবির সঙ্গে প্রবীণ চন্দ্রের প্রথমবারের সেই আলাপ তেমন জমেনি বলে রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন। কবি লিখেছেন, "তাহার পরে অনেক-বার তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইয়াছে কিন্তু উপলক্ষ ঘটে নাই। অবশেষে একবার যখন হাওড়ায় তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তখন সেখানে তাঁহার বাসায় সাহস করিয়া দেখা করিতে গিয়াছিলাম। দেখা হইল, যথাসাধ্য আলাপ করিবারও চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় মনের মধ্যে যেন একটা লজ্জা লইয়া ফিরিলাম। অর্থাৎ, আমি যে নিতান্তই অর্বাচীন, সেইটে অনুভব করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, এমন করিয়া বিনা পরিচয়ে বিনা আহ্বানে তাঁহার কাছে আসিয়া ভালো করি নাই।"

বঙ্কিমের গুরুগম্ভীর চাল দেখে তরুণ বয়স্ক রবীন্দ্রনাথ হয়তো

প্রথম আলাপে তেমন সহজ হতে পারেন নি। কিন্তু বঙ্কিম যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা উপলব্ধি করেছিলেন তা জানা যায়।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রণীত 'বাল্মীকির জয়' গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের বাল্মীকি প্রতিভার উল্লেখ করেন বঙ্গদর্শন পত্রিকায় ১২৮৮ আশ্বিনে (১৮৮১ অক্টোবর)। বঙ্কিম লিখেছেন, "যাঁহারা বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাল্মীকি প্রতিভা পড়িয়াছেন বা তাহার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা কবিতার জন্মবৃত্তান্ত কখনো ভুলিতে পারিবেন না।"

পরের বছর (১৮৮২ খ্রী) রবীন্দ্রনাথ পুনরায় বঙ্কিমের বাসায় যাতায়াত শুরু করেন। তখন বঙ্কিম ভবানীচরণ দত্ত ষ্ট্রীটের বাসিন্দা। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন, "বঙ্কিমবাবুর কাছে যাইতাম বটে কিন্তু বেশি কিছু কথাবার্তা হইত না। আমার তখন শুনিবার বয়স, কথা বলিবার বয়স নহে। ইচ্ছা করিত, আলাপ জমিয়া উঠুক, কিন্তু সংকোচে কথা সরিত না।" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা গ্রন্থে লিখেছেন, "কলিকাতায় বদলি হওয়ার পর জাজপুর গমন পর্যন্ত বঙ্কিমের বাসা কলিকাতার বউবাজার ষ্ট্রীটে ছিল ; সেখানে প্রায় প্রত্যহই সাহিত্যিক বৈঠক বসিত।...দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মধ্যে মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই সময়ে বঙ্কিমের নিকট যাতায়াত করিতেন।... ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩-এ জানুয়ারি...সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ আসিয়া তাঁহাদের জোড়াসাঁকোর বাটিতে বঙ্কিমকে লইয়া যান। সেই দিন ১১ই মাঘ [১২৮৮] ছিল।"

স্বর্ণকন্যা সরলা দেবী তাঁর 'জীবনের ঝরাপাতা' বইতে লিখেছেন, "একবার একটা ১১ই মাঘের উৎসবে বাড়ির ছেলেমেয়ে-গায়নমণ্ডলী আমরা গান গাইতে গাইতে হঠাৎ অনুভব করলুম আমাদের পিছনে একটা নাড়াচাড়া সাড়াশব্দ পড়ে গেছে। কে এসেছেন? পিছন ফিরে ভিড়ের ভিতর হঠাৎ একটি চেহারা চোখে পড়ল—দীর্ঘ নাসা, তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল দৃষ্টি, মুখময় একটা সহাস্য জ্যোতির্ময়তা। জানলুম তিনি

বঙ্কিম। যে বঙ্কিম এতদিন তাঁর বইয়ে রচনামূর্তিতে আমাকে পেয়ে বসেছিলেন আজ পেলুম তাঁকে প্রকৃতির তুলিতে হাড়েমাসে রঞ্জনা মূর্তিতে।”

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের উদ্যোগে ‘সারস্বত সমাজ’ নামে একটি পরিষৎ স্থাপিত হল। “বাংলার পরিভাষা বাঁধিয়া দেওয়া ও সাধারণত সর্বপ্রকার উপায়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পুষ্টিসাধন এই সভার উদ্দেশ্য ছিল।” এই সভার প্রথম অধিবেশন হয় ‘দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি ৬ নম্বর ভবনে’ রবিবার ২ শ্রাবণ ১২৮৯ (১৭ জুলাই ১৮৮২)। এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। অধিকাংশ উপস্থিত সভ্যের সম্মতিক্রমে প্রথম বর্ষের জন্য সভাপতি সহযোগী সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হন। সভাপতি হন রাজেন্দ্রলাল মিত্র। সহযোগী সভাপতি তিনজন—বঙ্কিমচন্দ্র, শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সম্পাদক মনোনীত হন কৃষ্ণবিহারী সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই অধিবেশনে স্থির হয় “যাঁহারা বঙ্গসাহিত্যে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা বাংলাভাষার উন্নতিসাধনে বিশেষ অনুরাগী, তাঁহারাই এই সমাজের সভ্য হইতে পারিবেন।” সভ্যদের বার্ষিক চাঁদা ৬ টাকা বছরের গোড়ায় দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন—এই সভা একটুখানি অঙ্কুরিত হয়েই শুকিয়ে গেল।

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ হয় রমেশচন্দ্র দত্তের কন্যার বিবাহসভায়। এই রমেশ দত্তকেই বঙ্কিম একদিন বাংলা ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টি করতে উদ্বোধিত করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের সন্ধ্যাসঙ্গীত কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় ৫ জুলাই ১৮৮২ (২২ আষাঢ় ১২৮৯)। রমেশ দত্তের মেয়ের বিবাহ হয় ১২৮৯ শ্রাবণে (১৮৮২ খ্রী)। এই নিমন্ত্রণসভাটি ছিল রবীন্দ্রনাথের পক্ষে একটি বিশেষ স্মরণীয় দিন। এই দিনটি ছিল রবীন্দ্রনাথের জীবনে সাহিত্যচর্চার প্রথম গৌরবের দিন। এই নিমন্ত্রণসভায় বঙ্কিমচন্দ্র নিজকণ্ঠ থেকে পুষ্পমাল্য

পরিয়ে দিয়েছিলেন সন্ধ্যাসঙ্গীতের কবির গলায়।

"রমেশ দত্ত মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যার বিবাহসভার দ্বারের কাছে বঙ্কিমবাবু দাঁড়াইয়া ছিলেন; রমেশবাবু বঙ্কিমবাবুর গলায় মালা পরাইতে উদ্যত হইয়াছেন এমন সময়ে আমি সেখানে উপস্থিত হইলাম। বঙ্কিমবাবু তাড়াতাড়ি সে-মালা আমার গলায় দিয়া বলিলেন, 'এ-মালা ইঁহারই প্রাপ্য। রমেশ, তুমি সন্ধ্যাসঙ্গীত পড়িয়াছ?' তিনি বলিলেন, 'না।' তখন বঙ্কিমবাবু সন্ধ্যাসঙ্গীতের কোনো কবিতা সম্বন্ধে যে-মত ব্যক্ত করিলেন তাহাতে আমি পুরস্কৃত হইলাম।"

লক্ষ্য করবার বিষয় সন্ধ্যাসঙ্গীত এক মাস কালও প্রকাশিত হয়নি, এর মধ্যেই ওই কাব্যখানি বঙ্কিমচন্দ্রের পড়া হয়ে গিয়েছে। হয়তো রবীন্দ্রনাথ তাঁর নূতন কাব্যগ্রন্থের একখানি কপি বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে উপহার দিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম উপন্যাস বৌ-ঠাকুরাণীর হাট ভারতী পত্রিকায় ধারাবাহিক মুদ্রিত হয় ১২৮৮ কার্তিক থেকে ১২৮৯ আশ্বিন পর্যন্ত। বই ছাপা হয় ১১ জানুয়ারি ১৮৮৩ (২৮ পৌষ ১২৮৯)। বৌ-ঠাকুরাণীর হাট উপন্যাসটি পড়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিজের থেকে একটি প্রশংসাপত্র পাঠিয়েছিলেন লেখককে। রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, "এই গল্প বেরোবার পরে বঙ্কিমের কাছ থেকে একটি অযাচিত প্রশংসাপত্র পেয়েছিলুম, সেটি ইংরেজি ভাষায় লেখা। সে পত্রটি হারিয়েছে কোনো বন্ধুর অযত্ন করক্ষেপে। বঙ্কিম এই মত প্রকাশ করেছিলেন যে, বইটি যদিও কাঁচাবয়সের প্রথম লেখা তবু এর মধ্যে ক্ষমতার প্রভাব দেখা দিয়েছে—এই বইকে তিনি নিন্দা করেননি। ছেলেমানুষের ভিতর থেকে আনন্দ পাবার এমন কিছু দেখেছিলেন যাতে অপরিচিত বালককে হঠাৎ একটা চিঠি লিখতে তাঁকে প্রবৃত্ত করলে। দূরের যে পরিণতি অজ্ঞানা ছিল সেইটি তাঁর কাছে কিছু আশার আশ্বাস এনেছিল। তাঁর কাছ থেকে এই উৎসাহবাণী আমার পক্ষে ছিল বহুমূল্য।"

রবীন্দ্রনাথ এখানে নিজেকে বঙ্কিমের 'অপরিচিত' বলে উল্লেখ

করেছেন। এ কথা ঠিক নয়। উপন্যাস সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ হয়তো 'অপরিচিত' ছিলেন সেদিন, কিন্তু বঙ্কিমের তিনি সুপরিচিত ছিলেন বৌ-ঠাকুরাণীর হাট প্রকাশের পূর্বেই।

শ্রীশ মজুমদার বঙ্কিমপ্রসঙ্গে লিখেছেন, "রবীন্দ্রবাবুর কথা উঠিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—'তাঁর উপন্যাস কি আপনি পড়িয়াছেন?' উত্তর—'পড়েছি। স্থানে স্থানে অতি সুন্দর সুন্দর উচ্চদরের লেখা আছে কিন্তু উপন্যাসের হিসাবে সেটা নিষ্ফল হয়েছে। রবিকে সে-কথা আমি বলেছি। উদীয়মান লেখকদের মধ্যে হরপ্রসাদ, তুমি ও রবির মধ্যে আমার বোধ হয় রবি বেশি গিফটেড কিন্তু পৃকোসাস, এখনি তাঁর বয়স ২২-২৩, সে-কথা সেদিন রবিকে বলেছি।"

১২৯১ শ্রাবণে (১৮৮৪ খ্রী) বঙ্কিমের নতুন মাসিকপত্র প্রচার প্রকাশিত হল। প্রচারের প্রথম সংখ্যায় বঙ্কিমের কয়েকটি রচনা প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে ছিল 'হিন্দুধর্ম' শীর্ষক প্রবন্ধ। ওই শ্রাবণে নবজীবন পত্রিকায় বঙ্কিম লিখেছিলেন 'ধর্মজিজ্ঞাসা'।

বঙ্কিমের ধর্মজিজ্ঞাসা পাঠ করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ১২৯১ ভাদ্র সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্কিমের সমালোচনা করে লিখলেন 'নব্য হিন্দু সম্প্রদায়'।

দ্বিজেন্দ্রনাথ পরে 'পুরাতন প্রসঙ্গে' বলেছেন—তিনি বঙ্কিমের লেখা সমালোচনা করায় বঙ্কিম ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন ও পরে প্রচারে বঙ্কিম প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন। "পত্রিকায় সমালোচনা বাহির হইবার পর তিনি প্রচারে এমনভাবে লিখিলেন যেন সমালোচনা আমার লেখা নহে—কর্তা স্বয়ং লিখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বাবা তখন অত্যন্ত পীড়িত। তাঁহার সঙ্গে তখন আমি চুঁচুড়ায় ছিলাম বটে, কিন্তু তিনি দোতালায় শয্যাগত ছিলেন। তিনি আমাকে এইটুক মাত্র বলিয়াছিলেন—'দেখ, বঙ্কিম যে রকম করে কৃষ্ণচরিত্রের [ধর্মতত্ত্ব হবে] আলোচনা করচে, তার একটা প্রতিবাদ হওয়া আবশ্যক।' তাই আমি প্রতিবাদ করিয়া পত্রিকায় লিখিয়াছিলাম। সে সমালোচনায় কর্তার কোনও হাত ছিল

না ; আগাগোড়া আমার নিজের।”

দ্বিজেন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধাদি গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করতেন এবং কোন্ লেখার প্রতিবাদ হওয়া উচিত—অসুস্থতার মধ্যেও তিনি পুত্রদের সে-বিষয়ে নির্দেশ দিতেন এবং পুত্রেরাও সে-নির্দেশ সর্বদা পালন করে গিয়েছেন।

বস্তুত পক্ষে বঙ্কিম দ্বিজেন্দ্রনাথের সমালোচনার কোনো প্রতিবাদ করেননি সে-সময়। দ্বিজেন্দ্রনাথের রচনাকে সমালোচনা বলেই বঙ্কিম গ্রহণ করেছিলেন, আক্রমণ বলে নয়। পরে রবীন্দ্রনাথ যখন ১২৯১ অগ্রহায়ণের ভারতীতে 'একটি পুরাতন কথা' নাম দিয়ে পুরাতন কথাকে আবার টেনে এনে বঙ্কিমকে নতুন করে 'আক্রমণ' করেন তখনই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রতিবাদ প্রবন্ধ লেখেন 'আদি ব্রাহ্মসমাজ ও নব হিন্দু সম্প্রদায়' শিরোনামে, প্রচারে ১২৯১ অগ্রহায়ণে (১৮৮৪ খ্রী)।

এই প্রবন্ধে বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধের উত্তরে নিজের বক্তব্য বিশ্লেষণ করে বলেন, “রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে এরূপ বিচারে আমার প্রবৃত্তি নাই। আমার যদি মনে থাকিত যে, আমি রবীন্দ্রবাবুর প্রতিবাদ করিতেছি, তাহা হইলে এতটুকুও বলিতাম না। এই রবির পিছনে যে ছায়া আছে, আমি তাহারই প্রতিবাদ করিতেছি বলিয়া এত কথা বলিলাম।”

দ্বিজেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনীতে লেখেন, “নবজীবনের প্রথম সংখ্যায় একপ্রকার নূতন হিন্দুধর্মের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইয়াছে—এবং তাহা প্রশ্নোত্তর আকারে ব্যাখ্যাত হইতেছে। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাহার লেখক—সুতরাং তাহা উপেক্ষণীয় নহে,—আবার তাহা ধর্মের মর্মে আঘাত করিতে উদ্যত—সুতরাং আমাদের নীরব থাকা অকর্তব্য। শ্রীযুক্ত বঙ্কিমবাবু আমাদের দেশের একজন প্রধান লেখক এবং তিনি স্বয়ং আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র ; তবে যে, আমরা তাঁহার প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইতোছ—সে কেবল কর্তব্যের অনুরোধে।”

প্রচার পত্রিকায় বঙ্কিম দ্বিজেন্দ্রনাথের সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখলেন, "তত্ত্ববোধিনীতে নব্য হিন্দু সম্প্রদায় এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধে আমার লিখিত ধর্মজিজ্ঞাসা সমালোচিত হয়। সমালোচনা আক্রমণ নহে। এই লেখক বিজ্ঞ, গম্ভীর এবং ভাবুক। আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা সব শুনিয়া, যদি প্রথম সংখ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া তিনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তবে তাঁহার কোনো দোষই দিতে পারিতাম না। তিনি যদি অকারণে আমার উপর নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি দোষ আরোপিত না করিতেন তবে আজ তাঁহার প্রবন্ধ এই গণনার ভিতর ধরিতে পারিতাম না। তিনি যে দয়ার সহিত সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আমার ধন্যবাদের পাত্র। বোধ হয় বলায় দোষ নাই যে এই লেখক স্বয়ং তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

তত্ত্ববোধিনীতে যে সংখ্যায় দ্বিজেন্দ্রনাথের সমালোচনা প্রকাশিত হয় সেই সংখ্যায় বঙ্কিমকে 'তিরস্কার' করে 'নূতন ধর্মমত' নামে আরও একটা সমালোচনা মুদ্রিত হয়। বঙ্কিম জানিয়েছেন, এই প্রবন্ধের লেখক দেবেন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ সুহৃদ রাজনারায়ণ বসু। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের রচনা ভারতী পত্রিকায় ১২৯১ অগ্রহায়ণে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমের প্রবন্ধ প্রকাশের (১২৯১ শ্রাবণ) দীর্ঘ চার মাস পরে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের বিরুদ্ধে কলম ধরেন পুরাতন প্রসঙ্গ টেনে 'একটি পুরাতন কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে। পত্রিকায় প্রকাশের অব্যবহিত পূর্বে রবীন্দ্রনাথ লেখাটি আদি ব্রাহ্মসমাজ হলে সর্বসমক্ষে পাঠ করেছিলেন।

কেন এই দীর্ঘ চার মাস রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের কোনো প্রতিবাদে আগ্রহ বোধ করেন নি?

১২৯১ আশ্বিনে (১৮৮৪ খ্রী) দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দ্বিজেন্দ্রনাথকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক এবং রবীন্দ্রনাথকে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে নিযুক্ত করেন। সমাজের সম্পাদক হয়েই রবীন্দ্রনাথ আদি ব্রাহ্মসমাজের পক্ষ সমর্থন করে বঙ্কিমের বিরুদ্ধে কলম ধরেন।

বঙ্কিমচন্দ্রও মনে করেন—এতদিন পরে রবীন্দ্রনাথের এ প্রবন্ধ নিশ্চয় কারও প্ররোচনায় রচিত।

বঙ্কিম তাঁর প্রবন্ধে লিখছেন, "যে কথা সাধারণ পাঠ্য-প্রবন্ধে বলা রুচিবিগর্হিত, যাহা Personal তাহা বলিতে বাধ্য হইলাম। আমার সৌভাগ্যক্রমে আমি রবীন্দ্রবাবুর নিকট বিলক্ষণ পরিচিত। শ্লাঘাস্বরূপ মনে করি,—এবং ভরসা করি, ভবিষ্যতেও মনে করিতে পারিব যে, আমি তাঁহার সুহৃজ্জন মধ্যে গণ্য হই। চারি মাস হইল প্রচারের সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারি মাস মধ্যে রবীন্দ্রবাবু অনুগ্রহপূর্বক অনেকবার আমাকে দর্শন দিয়াছেন। সাহিত্য বিষয়ে অনেক আলাপ করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গ কখনও উত্থাপিত করেন নাই। অথচ বোধ হয়, যদি ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া রবীন্দ্রবাবুর এমন বিশ্বাসই হইয়াছিল যে দেশের অবনতি, এবং ধর্মের উচ্ছেদ, এই দুইটি আমি জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছি, তবে যিনি ধর্ম প্রচারে নিযুক্ত, আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, এবং স্বয়ং সত্যানুরাগ প্রচারে যত্নশীল, তিনি এমন ঘোর পাপিষ্ঠের উদ্ধারের জন্য যে সে প্রসঙ্গ ঘুণাক্ষরেও উত্থাপিত করিবেন না, তার পর চারি মাস বাদে সহসা পরোক্ষ বাগ্মিতার উৎস খুলিয়া দিবেন, ইহা আমার অসম্ভব বোধ হয়।"

ধর্মবিষয়ে তর্ক-বিতর্ক যাই ঘটুক না কেন, শেষ পর্যন্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ তথা সমগ্র ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে বঙ্কিমন্দ্রের সম্পর্ক খুবই ভাল ছিল। আর বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল রবীন্দ্রনাথের প্রতি আন্তরিক অকৃত্রিম গভীর অনুরাগ। দীর্ঘ ছয় মাস ধরে বাদ-প্রতিবাদের যে ঝঞ্ঝা বইলো তার সমাপ্তি ঘটলো পরম প্রীতিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন, "এই বিরোধের অবসানে বঙ্কিমবাবু আমাকে যে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন আমার দুর্ভাগ্যক্রমে তাহা হারাইয়া গিয়াছে—যদি থাকিত তবে পাঠকেরা দেখিতে পাইতেন বঙ্কিমবাবু কেমন সম্পূর্ণ ক্ষমার সহিত এই বিরোধের কাঁটাটুকু উৎপাটন করিয়া ফেলিয়াছিলেন।"

রবীন্দ্রনাথ 'একটি পুরাতন কথা' প্রবন্ধটি আদি ব্রাহ্মসমাজ হলের যে-সভায় পাঠ করেছিলেন সেই সভার একটি বিবরণী পাই সরলা দেবীর লেখা থেকে। জীবনের ঝরাপাতা বইতে সরলা দেবী লিখছেন, "রবিমামার সঙ্গে ছেলেবেলায় একটি সভায় যাওয়া আমার মনে পড়ে। জীবনে এই প্রথম সভাগমন। কি excitement কি উদ্দীপনা আমাদের—সুরেন বিবি সুধীদাদা বলুদাদারাও আছেন। সভাটি আদি ব্রাহ্মসমাজ হলে আহূত। উদ্দেশ্য সে সভায় বঙ্কিমের একটি মতের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের তীব্র প্রতিবাদ পাঠ। বঙ্কিমের যশ ও কীর্তি তখন মধ্যাহ্ন গগনে সমুদিত আর রবি সবেমাত্র উদীয়মান। লোকদের মধ্যে একটা হলচল পড়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের নাম তখন তাঁর গানের ভিতরে রবিছায়াতেই প্রায় নিবদ্ধ। এই বক্তৃতায় যে ওজস্বী গদ্যে যে যুক্তিতর্কে তাঁর শ্রোতাদের মন আকৃষ্ট করলেন তা ইতিপূর্বে তাঁর সম্বন্ধে অভাবনীয়। সংক্ষেপে ব্যাপারটি এই—রবীন্দ্রনাথের প্রতিপাদ্য এই যে, মিথ্যা কোনো অবস্থাতেই কোনো সময়েই কথনীয় নয়। এ বিষয়ে ধর্মশাস্ত্রকারকৃত ব্যতিক্রম বিধিগুলি তিনি সমর্থন করেন না, বঙ্কিম করেন—এই প্রভেদ। রবীন্দ্রনাথের দুই অগ্রজ দ্বিজেন্দ্রনাথ ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ বিষয়ে শাস্ত্রকারদের ও বঙ্কিমের পক্ষাবলম্বী হলেন, তাঁরা বক্তৃতা-সভায় যোগদান করলেন না। কিন্তু ছোটরা তাঁর hero-worshipper হল।" সরলা দেবীর এই উক্তি থেকে মনে হয় দ্বিজেন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমের সঙ্গে প্রকাশ্যে মতবিরোধে রাজি হননি। রবীন্দ্রনাথের যে লেখা আদি ব্রাহ্মসমাজে পঠিত হল, সে লেখা তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা হওয়াই তো স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু তা তত্ত্ববোধিনীতে ছাপা না হয়ে ভারতী পত্রিকায় মুদ্রিত হল। তত্ত্ব-বোধিনীর সম্পাদক কি এই লেখা তাঁর পত্রিকায় ছাপতে চাননি?

১২৯১ অগ্রহায়ণে (১৮৮৪ খ্রী) বিরোধের অবসান ঘটে আর ওই বছর অর্থাৎ ১২৯১ মাঘে (১৮৮৫ খ্রী) বঙ্কিমের প্রচার পত্রিকায় দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের নতুন কবিতা প্রকাশিত হয়েছে।

ঠাকুরবাড়ির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা যে কত গভীর ছিল—তা জ্ঞানদানন্দিনী দেবী কর্তৃক সম্পাদিত বালক পত্রিকার দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায়। ঠাকুরবাড়ি থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় অর্থাৎ ১২৯২ বঙ্গাব্দের বৈশাখ (১৮৮৫ খ্রী) সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের একটি বৃহৎ চিত্র মুদ্রিত হল। চিত্রকর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বালক পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে 'মুখচেনা' বলে যে ধারাবাহিক নিবন্ধের সূত্রপাত করেন, তারই প্রথম কিস্তিতে বঙ্কিমচন্দ্রের ছবি মুদ্রিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজে বঙ্কিমচন্দ্রকে কাছে বসিয়ে এই পোর্ট্রেট এঁকেছিলেন। বঙ্কিমের জীবৎকালের মধ্যে মুদ্রিত আর কোনো ছবি এখনো পর্যন্ত আমাদের চোখে পড়েনি। সেইজন্য বালক পত্রিকায় মুদ্রিত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আঁকা ওই চিত্রটির একটি অসাধারণ মূল্য রয়েছে স্বীকার করতে হয়। বড় আকারের বালক পত্রিকার এক পাতায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজনারায়ণ বসুর ছবি ছাপা হয়।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'মুখচেনা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে যা লিখেছেন উদ্ধৃত করি—

"বঙ্কিমবাবুর উপরিভাগের কপাল উচ্চ ও প্রশস্ত। ইহাতে বিশ্লেষণ শক্তি সমালোচন শক্তি ও হাস্যরস প্রকাশ পায়। আবার ইহার নীচের দিককার কপাল বেশ উঁচু—ইহাতে ছোটখাট জিনিস খুব ইহার নজরে পড়ে। তত্ত্বজ্ঞান অপেক্ষা বিজ্ঞানের দিকে ইঁহার বেশি ঝোঁক প্রকাশ পায়। তত্ত্বজ্ঞানের বিষয় লিখিতে গেলেও ইঁনি বিজ্ঞানের প্রণালী অবলম্বন করিয়া লিখিতে ইচ্ছা করিবেন। বিশ্লেষণ শক্তি, পর্যবেক্ষণ শক্তি অধিক পরিমাণে থাকায় তাঁহার উপন্যাসে মানব চরিত্রের ও বাহ্য প্রকৃতির বর্ণনায় এরূপ অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পাইতেছে।…বঙ্কিমবাবুর অসাধারণ নাক। এই নাকে সুরুচি, অভিনিবেশ, মানব চরিত্রজ্ঞান ও অসাধারণ উদ্যম প্রকাশ পায়। তাঁহার এজলাসি কাজ সত্ত্বেও, উপর্যুপরি এত উৎকৃষ্ট গ্রন্থ যে তিনি লিখিতে পারিয়াছেন সে কেবল

তাঁর নাকের জোরে।...বঙ্কিমবাবুর ঠোঁট খুব সরু—ইহাতে কার্যকরী বুদ্ধি—সূক্ষ্ম রুচি ও অসাধারণ দৃঢ়তা প্রকাশ পায়। বঙ্কিমবাবুর চোখে বহির্দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণতা প্রকাশ পায়।...বঙ্কিমবাবুর চেহারায় নেপোলিয়ানের মুখের কিছু আভাস পাওয়া যায়। নেতার লক্ষণ ইহার মুখে জাজ্বল্যমান। ইহার খড়্গ-নাসা, চাপা ঠোঁট, তীক্ষ্ণ চোখ লইয়া ইনি যদি কাহারও উপরে গিয়া পড়েন তবে সে হতভাগ্য বজ্রাঘাতের মর্ম বুঝিতে পারে। বঙ্কিমবাবুর নাকের নিম্নদেশ যেরূপ ঝুঁকিয়া আসিয়াছে, এবং তাঁহার চিবুকের নীচে যেরূপ ফুল দেখা যাইতেছে ইহাতে তাঁহার অর্থোপার্জনস্পৃহা ও মিতব্যয়িতা প্রকাশ পাইতেছে।"

এই বালক পত্রিকাতেই জ্যৈষ্ঠ (১২৯২) সংখ্যায় মুদ্রিত হল বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের স্বরলিপি। স্বরলিপিকর্ত্রী প্রতিভা-সুন্দরী দেবী। স্বরলিপির ভূমিকায় লেখা 'বঙ্কিমবাবুর রচিত বন্দেমাতরং নামক বিখ্যাত গানটির সমস্তটা দেওয়া গেল না, কারণ উক্ত গানের সুর অত্যন্ত কঠিন, সমস্তটা দিলে পাঠকের সহজে আয়ত্ত হইবে না।" বালকের এই সংখ্যায় বন্দেমাতরম্ গানের ভাব অবলম্বনে পূর্ণ পৃষ্ঠার একখানি মনোরম চিত্র মুদ্রিত হয়। ছবির নীচে ছাপা— 'বন্দে মাতরং'।

এই সব নানা ঘটনা থেকে বোঝা যায় ঠাকুরবাড়ির লোকজন সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। যে বাড়ির ছেলেরা সকলেই প্রায় কবি ও গীতিকার সেই বাড়ির পত্রিকায় বঙ্কিমের গানের স্বরলিপি প্রথম প্রকাশিত হল—এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। রবীন্দ্রনাথ পরে নিজকৃত সুরে বন্দেমাতরম্ গানের প্রথমাংশ বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে গেয়ে শোনান। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে সরলা দেবী সমগ্র বন্দেমাতরম্ গানে সুর দেন।

সরলা দেবী লিখছেন, "বঙ্কিমের স্মৃতি প্রসঙ্গে বন্দেমাতরম্ গান ও মন্ত্রের স্মৃতি ভেসে না উঠে যায় না। সে গান বঙ্কিম-ভক্তিতে ডোবা আমার প্রাণে প্রথম ফোটেনি। তার ফোটানতে ছিল রবীন্দ্রের হাত।

জীবনের প্রথম দিকে কাব্য বা সঙ্গীতের রসগ্রাহিতায় রবীন্দ্রের আত্মপর বিচার ছিল না। যে কবির যেটি ভালো লাগতো সেটিতে নিজের সুর বসিয়ে, গেয়ে ও গাইয়ে তার প্রচার করতেন। রবীন্দ্রনাথই বন্দেমাতরম্-এর প্রথম সুর বসিয়েছিলেন। তাঁর দেওয়া সুরে ঐ দুটি পদে গানটি সর্বত্র চলিত হল। একদিন মাতুল আমায় ডেকে বললেন—'তুই বাকিটুকুতে সুর দিয়ে ফেল না।' ওরকম ভার মাঝে মাঝে আমায় দিতেন। তাঁর আদেশে 'সপ্তকোটিকণ্ঠ কলকলনিনাদকরালে' থেকে শেষ পর্যন্ত ভাবের সঙ্গে ও গোড়ার সুরের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সুর দিয়ে ফুটিয়ে নিলুম। দুই একটা জাতীয় উৎসবে সমস্বরে বহু-কণ্ঠে বহুজনকে গাইতেও শেখালুম। সেই থেকে সভাসমিতিতে সমস্তটাই গাওয়া হতে থাকলো।"

বঙ্কিমের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রকাশিত হল ১৮৮৬-র আগস্টের গোড়ায় (১২৯৩ শ্রাবণ)। বঙ্কিম তাঁর নতুন বইখানি দ্বিজেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথকে পাঠালেন। দ্বিজেন্দ্রনাথকে চিঠি লিখলেন—

"শ্রদ্ধাস্পদেষু তিনখানি কৃষ্ণচরিত্র পাঠাইলাম। অনুগ্রহপূর্বক আপনি একখানি গ্রহণ করিবেন। জ্যোতিঃ ও রবিবাবু এখন কোথায় তাহা জানি না। এ কারণ তাঁহাদের জন্য দুইখানি পুস্তক আপনার নিকটেই পাঠাইলাম। অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাদিগের কাছে পাঠাইয়া দিবেন। ভরসা করি আপনারা ভাল আছেন। ইতি তাং ১০ই আগস্ট / শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।"

১২৯১ থেকে এদিকে ভারতী পত্রিকার সম্পাদন ভার গ্রহণ করেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী। প্রথম পর্যায়ে তিনি ১২৯১ থেকে ১৩০১ পর্যন্ত পত্রিকা সম্পাদন করেন। স্বর্ণকুমারী দেবী প্রায়ই বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে যেতেন। ভারতীর লেখকশ্রেণীর মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম বিজ্ঞাপিত হয়েছিল। স্বর্ণকুমারীকে বঙ্কিম লেখা দেবেন কথা দিয়েছিলেন। কিন্তু কাজের চাপে ও নানা ব্যস্ততার কারণে বঙ্কিম শেষ

পর্যন্ত ভারতীতে কোনো লেখা দিতে পারেন নি। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও পারেন নি।

দেখতে দেখতে দিন গড়িয়ে যায়। নতুন নতুন পত্রিকা জন্ম নিতে থাকে মধ্যে মধ্যে। সুরেশ সমাজপতির সাহিত্য বেরলো ১২৯৭ বৈশাখে (১৮৯০ খ্রী)। এই পত্রিকায় সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১২৯৮ জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায় লিখলেন দুটি সমালোচনা প্রবন্ধ—সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী, আর কপালকুণ্ডলা ও মিরাণ্ডা। সাপ্তাহিক হিতবাদী পত্রিকা বেরলো ১২৯৮ জ্যৈষ্ঠে (১৮৯১ খ্রী)। পত্রিকার প্রধান সম্পাদক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। পত্রিকার সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক হলেন রবীন্দ্রনাথ। পত্রিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিম-চন্দ্রকে লেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে বঙ্কিম যে সম্মতি জানিয়েছিলেন তা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি থেকে জানা যায়। শ্রীশ মজুমদারকে রবীন্দ্রনাথ এই হিতবাদীর জন্য লেখা চেয়ে যে চিঠি দেন তাতেই পত্রলেখক লিখেছেন, "বঙ্কিম, রমেশ দত্ত প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল লোক লেখায় যোগ দিতে রাজি হয়েছেন।" তবে এই পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংশ্রব বেশি দিন ছিল না বলে বঙ্কিমের এখানে লেখার প্রশ্ন ওঠে না।

১২৯৮ অগ্রহায়ণে (১৮৯১ খ্রী) রবীন্দ্রনাথের উদ্যোগে ঠাকুরবাড়ির নতুন মাসিকপত্র বেরলো—সাধনা। এই পত্রিকায় নামে সম্পাদক হলেন সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ; কিন্তু কার্যত সম্পাদনার সকল দায়িত্ব হাতে নিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। সাধনা পত্রিকার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা চাইলেন রবীন্দ্রনাথ। ঠাকুরবাড়ির দুটি কাগজ চলেছে একই সঙ্গে—পুরাতন ভারতী ও নূতন সাধনা। সুরেশ সমাজপতির সাহিত্য বেরিয়েছে সাধনার আগের বছর। বঙ্কিমের কাছে লেখার জন্য হাত পেতেছেন স্বর্ণকুমারী দেবী, রবীন্দ্রনাথ ও সুরেশ সমাজপতি। স্বর্ণকুমারী প্রায়ই আসেন বঙ্কিমের বাড়িতে। চাটুজ্যে পরিবারের সঙ্গেই স্বর্ণকুমারী ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও সাধনার ঝুলি নিয়ে বঙ্কিমের

কাছে উপস্থিত হন। সুরেশ সমাজপতি সাহিত্যের জন্য লেখা চাইলে বঙ্কিম বলেন, "আমি যে তোমার কাগজে কিছু দিতে পারিতেছি না, তাহার কারণ আছে। অন্ততঃ চারিটি প্রবন্ধ না লিখিলে হয় না। তা পারিয়া উঠিতেছি না।" সুরেশচন্দ্র বলেন, "একটাই দিন না।" বঙ্কিম বললেন, "শুধু তোমাকে একটা দিলে তো চলিবে না। স্বর্ণকুমারী আসেন; আমার নাতিদের কত খেলনা দিয়া গিয়াছেন। আমি ত সব বুঝি। তাঁহার ভারতী আছে। রবি আসেন; জানো ত, প্রচারের সময় এক পালা হইয়া গিয়াছে। তাঁহার সাধনা আছে। তুমি আছ, তোমার সাহিত্য আছে।" সাধনা পত্রিকাতেও বঙ্কিম শেষ পর্যন্ত কিছু লিখে উঠতে পারেন নি।

স্বর্ণকুমারী দেবীর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কন্যা সরলা দেবীর সঙ্গেও বঙ্কিমের আলাপ-পরিচয় হয়েছিল। সরলা দেবীর তখন আঠারো উনিশ বছর বয়স। ভারতীতে লেখালিখি শুরু করেছেন। সরলা দেবী লিখছেন, "তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ সংস্পর্শ আনলে আমার লেখা পড়ে তাঁর চিঠি। সে চিঠি ত যে সে চিঠি নয়। তার দু-চারটি মাত্র সেন্টেন্স বঙ্কিমেরই সেন্টেন্স বটে। ভারতীতে আমার আঠার উনিশ বৎসরের লেখা 'রতিবিলাপ' ও 'মালবিকাগ্নিমিত্র' পড়ে তাঁর লেখা চিঠি। সে চিঠি সাহিত্য দায়রায় দণ্ডায়মান একজন নবীনের উপর তাঁর রায়—বা তাকে দুই বাহু বাড়িয়ে আদর করে নেওয়া। যদিও রবিমামার চিঠিতে তাঁরও appreciation ব্যক্ত হয়েছিল, কিন্তু তাঁর চেয়েও সেদিন সাহিত্যসম্রাট ও সাহিত্যের ন্যায়াধীশ বঙ্কিমের রায়ে নিজেকে বেশি চরিতার্থ মনে করলুম।...বঙ্কিমের চিঠির সাথী হয়ে এসেছিল সেদিন তাঁর নিজের এক সেট বই উপহার—অপ্রত্যাশিত স্নেহ-নিদর্শন। তাঁর হস্তলিপিযুক্ত সে বইগুলিও রাখতে পারিনি শেষ পর্যন্ত।...চিঠি ও বই উপহারের পর তিনি আমন্ত্রিত হয়ে এলেন একদিন আমাদের বাড়িতে। মানুষ বঙ্কিমের সঙ্গে আমাদের সংস্পর্শ আরম্ভ হল। মনে পড়ে তিনি চা-ভক্ত ছিলেন, আর আমার পিতা ছিলেন চায়ের একজন

মর্মজ্ঞ। আমাদের বাড়ির চা বঙ্কিমের সুস্বাদু বোধ হল। তার পরদিন সেই চায়ের এক প্যাকেট এক গোছা গোলাপ ফুলের সঙ্গে তাঁর কাছে উপঢৌকন গেল। কোথায় বঙ্কিমের এক সেট বই—আর কোথায় দার্জিলিংয়ের এক প্যাকেট চা। কিন্তু দুয়েরই পশ্চাতে প্রেরক ছিল যে দুটি ভাব—স্নেহ ও ভক্তি—তারা বোধ হয় সমানই অমূল্য। তিনি সেদিন আমায় ফরমাস করে গিয়েছিলেন তাঁর সাধের তরণী গানটিতে সুর বসাতে। থিয়েটারে দেওয়া সুর তাঁর পছন্দ হয়নি বললেন। সেটা শুনতে এলেন আর একদিন—শুনে খুব খুশি হয়ে গেলেন। বঙ্কিমের ফরমাসী এই গানের স্বরলিপি 'শতগান' গ্রন্থে দেওয়া আছে। তারপরে আমাদের—আমার মাকে ও আমাকে—দিদি তখন বিয়ে হয়ে নিজের বাড়িতে থাকেন—নিমন্ত্রিত করে নিয়ে গেলেন তাঁর বাড়ি একদিন। তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত হল। বঙ্কিমের স্ত্রীর সহিত বা তাঁর সম্পর্কীয় কথাবার্তায় একটি সুন্দর প্রীতিময় হাসিকৌতুকের ঢেউ খেলিয়া যেত। আমরা যেন তাঁর নভেলেরই একটা দৃশ্যের মধ্যে পড়ে যেতুম।"

বাল্যকালে রবীন্দ্রনাথ বৌঠানের সঙ্গে নির্জন দুপুরে বঙ্গদর্শন পড়েছিলেন—পড়েছিলেন নগেন্দ্রনাথ ও কুন্দনন্দিনীর প্রেমের কাহিনী বিষবৃক্ষ; অপর দিকে জীবনসায়াহ্নে মাসে মাসে বঙ্কিমের হাতে এসে পৌঁছায় রবীন্দ্রনাথের পত্রিকা সাধনা। এই সাধনায় ১২৯৯ পৌষ (১৮৯২-৯৩ খ্রী) সংখ্যায় প্রকাশিত হল রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ 'শিক্ষার হেরফের'। বঙ্কিম সাধনায় প্রবন্ধটি পড়ে অত্যন্ত খুশি হয়ে প্রবন্ধকারকে লিখলেন, "পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুইবার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম, এবং একদিন সেনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।" বঙ্কিমের পত্রের এই অংশ সাধনার পৌষ সংখ্যার প্রসঙ্গ-কথা বিভাগে উদ্ধৃত হয়।

সাধনায় ১৩০০ বঙ্গাব্দের (১৮৯৩ খ্রী) আশ্বিন-কার্তিক যুক্ত-সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের 'ইংরাজ ও ভারতবাসী' প্রবন্ধ বেরলো। সাধনায় প্রকাশের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধটি চৈতন্য লাইব্রেরিতে পাঠ করেন। সেদিন সভামঞ্চে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের অনুরোধেই বঙ্কিমচন্দ্র এই পাব্লিক সভায় সভাপতি হতে সম্মত হয়েছিলেন। একই মঞ্চে চন্দ্র সূর্য—বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। সভায় পাঠের পূর্বে একদিন রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে এই প্রবন্ধটি সম্পূর্ণ শুনিয়ে এসেছিলেন। বঙ্কিম প্রবন্ধটি শুনে সপ্রশংস অভিমত প্রকাশ করেন ও সভামঞ্চে সভাপতির আসনে বসতে সম্মত হন।

চৈতন্য লাইব্রেরিতে প্রবন্ধ পাঠের কয়েক দিন পর ১৮৯৩ সেপ্টেম্বরে রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীকে লিখছেন, "বক্তৃতার খবরটা পেয়েছ দেখছি। চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদকের অবিশ্রাম উত্তেজনায় এই অসমসাহসিক কার্যে প্রবৃত্ত হয়েছিলুম, নইলে পাব্লিকের কাছে ঘেঁষতে আমার আর বড় ইচ্ছে করে না। আমার খুব ইচ্ছা ছিল বক্তৃতাটা তোমাদের একবার শুনিয়ে নিয়ে রঙ্গস্থলে প্রবেশ করতে। কিন্তু সে সময় কলকাতায় তোমরা কেউ উপস্থিত ছিলে না।···একবার কেবল বঙ্কিমবাবুকে শোনাতে হয়েছিল, তাঁর প্রশংসাবাক্যে অনেকটা নিরুদ্বিগ্ন হয়েছিলুম।"

সাধনায় ১৩০০ চৈত্র (১৮৯৪ খ্রী) সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমের রাজসিংহ উপন্যাসের দীর্ঘ সমালোচনা লেখেন। পত্রিকা বেরোল কিন্তু বঙ্কিম এ সংখ্যা আর দেখে যাবার অবকাশ পেলেন না। প্রায় এক মাস রোগযন্ত্রণা ভোগ করার পর সাহিত্যসম্রাটের তিরোধান ঘটলো ১৩০০ বঙ্গাব্দের ২৬ চৈত্র, ১৮৯২-এর ৮ এপ্রিল।

তাঁর মৃত্যুর পর স্টার থিয়েটার হলে চৈতন্য লাইব্রেরির বিশেষ অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্কিমচন্দ্র' শীর্ষক মহামূল্য প্রবন্ধখানি পাঠ করে সাহিত্যসম্রাটের প্রতি তাঁর অন্তরের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ১৩০১ বৈশাখের সাধনায় রচনাটি ছাপা হয়। যে-সাধনায় বঙ্কিমের

নিজের লেখার কথা ছিল সেই সাধনায় তাঁর উদ্দেশে শোকপ্রস্তাব প্রকাশ করতে হল রবীন্দ্রনাথকে।

বঙ্কিমের তিরোধান প্রসঙ্গে সরলা দেবীর মন্তব্য, "যেদিন বঙ্কিমের মৃত্যু সংবাদ হঠাৎ কানে এল—মনে হল আমারই জীবনের একাংশ খসে গেল।"

শরতের বঙ্কিমচন্দ্র

"আমার মনে আছে, ছেলেবেলায় 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর রোহিণীর চরিত্র আমাকে অত্যন্ত ধাক্কা দিয়েছিল। সে পাপের পথে নেমে গেল। তার পরে পিস্তলের গুলিতে মারা গেল। গরুর গাড়িতে বোঝাই হয়ে লাস চালান গেল।" —শরৎচন্দ্র

সাহিত্যের আকাশে বঙ্কিমচন্দ্র যখন অস্ত গেলেন শরৎচন্দ্রের বয়স তখন প্রায় আঠারো বছর। শরৎচন্দ্র তাঁর প্রথম রচনা কোরেল গল্পটি লিখতে শুরু করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালেই। সেটা তখন ১৮৯৩ সালের মাঝামাঝি সময়। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয় কোরেল রচনারম্ভের প্রায় এক বছর পরে—১৮৯৪ সালের এপ্রিল মাসে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে—বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালপর্বের মধ্যেই শরৎচন্দ্রের সাহিত্যসাধনার সূত্রপাত।

শরৎচন্দ্র কৈশোরে ছিলেন বঙ্কিমসাহিত্যের একজন অত্যন্ত অনুরাগী ও মুগ্ধ পাঠক। পরবর্তীকালে তিনি শুধু বঙ্কিমসাহিত্যের অনুরাগী পাঠকমাত্রই ছিলেন না; সমালোচকের দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার দোষ-গুণ, তাঁর কৃতিত্ব ও দুর্বলতা—সযত্নে, অতিশয় আন্তরিকতার সঙ্গে বিচার ও বিশ্লেষণ করেছেন।

কৈশোরেই বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর সঙ্গে শরৎচন্দ্রের পরিচয় ও সঙ্গে সঙ্গে অন্তরঙ্গতা জন্মায়। শরৎচন্দ্র তাঁর কৈশোর বয়সের কথা স্মরণ করে লিখেছেন, "উপন্যাস সাহিত্যে এর পরেও যে কিছু আছে, তখন ভাবতেও পারতাম না।" শরৎচন্দ্র কৈশোরে যে কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্ত পাঠক-মাত্রই ছিলেন, তা নয়—বঙ্কিমচন্দ্রের রচিত কাহিনীর অভিনয়ও করেছেন তিনি সেই বয়সে রীতিমতো। তাঁর জীবনী থেকে জানা যায় তিনি ছেলেবেলায় বঙ্কিমচন্দ্রের মৃণালিনী উপন্যাসে অভিনয় করেছিলেন। কোন্ চরিত্রে? সুন্দরী রমণীমূর্তিতে একেবারে নাম ভূমিকায়—অর্থাৎ মৃণালিনীর চরিত্রে।

বঙ্কিমপর্বে যিনি আবির্ভূত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালের মধ্যেই যিনি সাহিত্যসাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তাঁর রচনা, অন্তত তাঁর রচনার আদি পর্ব যে সাহিত্যসম্রাটের রচনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। শরৎচন্দ্র যখন সাহিত্যচর্চা শুরু করেন তখন বঙ্কিমচন্দ্রই ছিলেন তাঁর কাছে একমাত্র আদর্শ ঔপন্যাসিক। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিতকালে রবীন্দ্রনাথের মাত্র দুটি উপন্যাস-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়—বউ ঠাকুরাণীর হাট ও রাজর্ষি। সুতরাং ঔপন্যাসিক রূপে রবীন্দ্রনাথ নন, বঙ্কিমচন্দ্রই ছিলেন শরৎচন্দ্রের আদিপর্বে আকর্ষণীয় প্রতিভা।

কৈশোরে বঙ্কিমের উপন্যাসগুলি পাঠ প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্রের মন্তব্য, "প'ড়ে প'ড়ে বইগুলি যেন মুখস্থ হয়ে গেল। বোধহয় এ আমার একটা দোষ। অন্ধ অনুকরণের চেষ্টা না করেছি যে নয়। লেখার দিক দিয়ে সেগুলো একেবারে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু চেষ্টার দিক দিয়ে তার সঞ্চয় মনের মধ্যে আজও অনুভব করি।"

এই শরৎচন্দ্রই পরবর্তীকালে ১৯২৩ সালে একটি সাহিত্য সভায় সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন, "সম্প্রতি একটা কলরব উঠিয়াছে যে, আধুনিক উপন্যাসলেখকেরা বঙ্কিমসাহিত্যকে ডুবাইয়া দিল। বঙ্কিম সাহিত্য ডুবিবার নয়। সুতরাং আশঙ্কা তাঁহাদের বৃথা। কিন্তু আধুনিক ঔপন্যাসিকদের বিরুদ্ধে এই যে নালিশ যে, ইহারা বঙ্কিমের ভাষা, ভাব, ধরণ-ধারণ, চরিত্রসৃষ্টি কিছুই আর অনুসরণ করিতেছে না, অতএব অপরাধ ইহাদের আমার্জনীয়, ইহার জবাব দেওয়া একটা প্রয়োজন। আমি বয়সে যদিচ প্রাচীন হইয়াছি, কিন্তু সাহিত্যব্যবসায় আজও আমার বছর দশেক উত্তীর্ণ হয় নাই। অতএব আধুনিকদের পক্ষ হইতে উত্তর দিই ত বোধ করি অন্যায় হইবে না। অভিযোগ ইহাদের সত্য, আমি তাহা অকপটে স্বীকার করিতেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা আমাদের কাহারো অপেক্ষা কম নয়, এবং সেই শ্রদ্ধার জোরেই আমরা তাঁহার ভাষা, ভাব পরিত্যাগ করিয়া আগে চলিতে দ্বিধা বোধ করি

নাই। মিথ্যা ভক্তির মোহে আমরা যদি তাঁহার সেই ত্রিশ বৎসর পূর্বেকার বস্তুই শুধু ধরিয়া পড়িয়া থাকিতাম, তো কেবল গতির অভাবেই বাংলা সাহিত্য আজ মরিত। দেশের কল্যাণে একদিন তিনি নিজে প্রচলিত ভাষা ও পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া পা বাড়াইতে ইতস্তত করেন নাই, তাঁহার সেই নির্ভীক কর্তব্যবোধের দৃষ্টান্তকেই আজ যদি আমরা তাঁহার প্রবর্তিত সাহিত্যসৃষ্টির চেয়েও বড় করিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি, তো সে তাঁহার মর্যাদা হানি করা নয়। এবং সত্যই যদি তাঁহার ভাষা, ধরণ-ধারণ, চরিত্র-সৃষ্টি প্রভৃতি সমস্তই আমরা আজ ত্যাগ করিয়া গিয়া থাকি তো দুঃখ করিবারও কিছু নাই।"

পুত্র ও শিষ্যের নিকট পরাজিত হওয়াও গৌরবের। শরৎচন্দ্র যদি সাহিত্যাদর্শে বঙ্কিমচন্দ্রকে অতিক্রম করে থাকেন—তবে তাকে কখনই বঙ্কিমচন্দ্রের পরাজয় বলবো না, বলবো—সেখানেই বঙ্কিমের সাফল্য, সৃষ্টির সার্থকতা। ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি, যাঁকে পরিপূর্ণরূপে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা করা যায় যথার্থভাবে তাঁকেই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার ও বিশ্লেষণ করার অবকাশ ঘটে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল বলেই বঙ্কিমের যথার্থ মূল্যায়ন করতে শরৎচন্দ্র দ্বিধা করেন নি।

বঙ্কিমের বিষবৃক্ষ চন্দ্রশেখর ও কৃষ্ণকান্তের উইল শরৎচন্দ্রকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। চন্দ্রশেখর উপন্যাস প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন —বঙ্কিমের কালে পাঠকের দাবি বেশি ছিল না। "কিন্তু এখনকার দিনের পাঠকেরা অত্যন্ত তার্কিক, তাহারা গ্রন্থকারের মুখের কথায় বিশ্বাস করিতে চাহে না, নিজে তাহারা বিচার করিয়া দেখিতে চায় শৈবলিনী লোক কিরূপ ছিল, তাহার কতখানি প্রেম জন্মিয়াছিল, জন্মানো সম্ভবপর কি না এবং এত বড় একটা অন্যায় করিবার পক্ষে সেই প্রেমের শক্তি যথেষ্ট কি না। প্রতাপ এত বড় একটা কাজ করিল, কিন্তু এখনকার দিনের পাঠক হয়তো অবলীলাক্রমে বলিয়া বসিবে—কি এমন সে করিয়াছে! শৈবলিনী পরস্ত্রী, গুরুপত্নী,—নিজের ঘরে

পাইয়া তাহার প্রতি অত্যাচার করে নাই, এমন অনেকেই করে না, এবং করিলে গভীর অন্যায় করা হয়। আর তার যুদ্ধের অজুহাতে আত্মহত্যা? তাহাতে পৌরুষ থাকিতে পারে, কিন্তু কাজ ভাল নয়। সংসারের উপরে, নিজের স্ত্রীর উপরে এই যে একটা অবিচার করা হইয়াছে, আমরা তাহা পছন্দ করি না। আর তাহার মানসিক পাপের প্রায়শ্চিত্ত? তা আত্মহত্যায় আবার প্রায়শ্চিত্ত কিসের?"

কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণীর মৃত্যু ঘটেছিল গোবিন্দলালের পিস্তলের গুলিতে। শরৎচন্দ্র কৃষ্ণকান্তের উইল প্রসঙ্গে বলছেন, "পাপের শাস্তি না হইলে গ্রন্থ শিক্ষাপ্রদ হইবে না, অতএব শাস্তি চাই-ই। এই 'চাই-ই'এর জন্য গ্রন্থকারকে যে অদ্ভুত উপায় অবলম্বন করিতে হইয়াছে সেইখানেই আমাদের বড় বাধা। রোহিণীর গোবিন্দ-লালকে ভালোবাসিবার যে শক্তি, সাধারণ নারীতে তাহা অসম্ভব,—উইল বদলাইতে সে কৃষ্ণকান্তের মত বাঘের ঘরে ঢুকিয়াছিল—গোবিন্দ-লালের ভালো করিতে বারুণীর জলতলে প্রাণ দিতে গিয়াছিল—সে এমনিই প্রিয়তমের জন্য; আবার সেই রোহিণীই যখন কেবলমাত্র নীতি-মূলক উপন্যাসের উপরোধেই অকারণে এবং এক মুহূর্তের দৃষ্টিপাতে সমস্ত ভুলিয়া, আর একজন অপরিচিত পুরুষকে গোবিন্দলালের অপেক্ষাও বহুগুণে সুন্দর দেখিয়া প্রাণ দিল, তখন পুণ্যের জয় ও পাপের পরাজয় সপ্রমাণ করিয়া সাংসারিক লোকের সুশিক্ষার পথে হয়তো প্রভূত সাহায্য করা হইল, কিন্তু আধুনিক লেখক তাহাকে গ্রহণ করিতে পারিল না। রোহিণী পাপিষ্ঠা, এবং যে পাপিষ্ঠার প্রতি আমাদের কোনো সহানুভূতি নাই, তাহারও প্রতি কিন্তু এত বড় অবিচার করিতে আমাদের হাত উঠে না। সেকাল ও একালে এখানেই মস্ত বড় ব্যবধান।"

অন্যত্র শরৎচন্দ্র বলেছেন—রোহিণীর মৃত্যু-ঘটনায় "হিন্দুসমাজও পাপীর শাস্তিতে তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো। কিন্তু আর একটা দিক—? যেটা এদের চেয়ে পুরাতন, এদের চেয়ে সনাতন, নরনারীর

হৃদয়ের গভীরতম, গূঢ়তম প্রেম— ?” এটাই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের শেষ প্রশ্ন।

শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসগুলিতে কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি ও অসম্পূর্ণতা থাকলেও ; তাঁর মতে—এই উপন্যাসগুলির সাহিত্য বা শিল্পমূল্য অসামান্য। কথাসাহিত্যের বিচারে আনন্দমঠ দেবী চৌধুরাণী বা সীতারামের তুলনায় বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল অনেক উৎকৃষ্ট। শরৎচন্দ্রের ভাষায় বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল ‘বঙ্গসাহিত্যের মহামূল্য সম্পদ’। বঙ্কিম যেখানে পরিপূর্ণ শিল্পী, শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা ও অনুরাগ সেইখানেই অঞ্জলি প্রদান করেছে।

সেকালে বঙ্কিমচন্দ্রের বইয়ের বাজার

"ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গ্রন্থেরও একটু বাহ্য সৌষ্ঠব চাই, এজন্য পুস্তকগুলি সোনার জলে এবং কাপড়ে বাঁধাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকি।" —বঙ্কিমচন্দ্র

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে তাঁর বইপত্রের বেচাকেনা ব্যবসা-বাণিজ্য কি রকম ছিল জানতে কৌতূহল হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র দীর্ঘায়ু ছিলেন না, ছাপ্পান্ন বৎসর বয়সে তাঁর তিরোধান ঘটে। তাঁর প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হয় জীবনের ঠিক মধ্যাহ্নে—লেখকের সাতাশ বৎসর বয়সে। আর পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে লেখেন শেষ উপন্যাসখানি—পুনঃপ্রণীত রাজসিংহ। ১৮৮৭ সালে প্রকাশিত সীতারাম গ্রন্থটিকে সাধারণভাবে তাঁর শেষ উপন্যাস বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ১৮৯৩-এর আগস্ট মাসে প্রকাশিত পুনঃপ্রণীত রাজসিংহই তাঁর প্রকৃত সর্বশেষ উপন্যাস। ১৮৮২ সালে রাজসিংহের যে ক্ষুদ্রকথা ছাপা হয়েছিল তার তুলনায় নবরচিত রাজসিংহ আয়তনে পাঁচ গুণ বড়। অর্থাৎ বলা যেতে পারে তাঁর লেখক জীবনের কাল পরিধি তাঁর আয়ুষ্কালের ঠিক অর্ধেক। জীবনের এই অর্ধাংশেই তিনি যা দিয়ে গেলেন তা একই সঙ্গে মহনীয় এবং অবিস্মরণীয়।

দুর্গেশনন্দিনী বঙ্কিমের প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস হলেও তাঁর প্রথম বইটি দুর্গেশনন্দিনীর প্রায় এক দশক আগে মুদ্রিত। বইটি কবিতার, নাম ললিতা—পুরাকালিক গল্প—তথা মানস। বই প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের বিজ্ঞাপনও ছাপা হয়ে বেরলো ঈশ্বর গুপ্তের বিখ্যাত সংবাদ প্রভাকরের ১৮৫৬-র ৩০ জুন সংখ্যায়। বিজ্ঞাপনটি ছিল এই রকম—

বিজ্ঞাপন

ললিতা ও মানস

উক্ত উভয় পুস্তক পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে মতকর্তৃক বিরচিত হইয়া সম্প্রতি প্রকাশ হইয়াছে। যাঁহার প্রয়োজন হয় প্রভাকর যন্ত্রালয়ে অথবা পটলডাঙ্গার ৮৬ নং নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরিতে তত্ত্ব করিলে পাইতে পারিবেন। ঐ পুস্তকদ্বয় একত্রে বান্ধন হইয়াছে। মূল্য ছয়

আনা। শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়॥

এটিই সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থের প্রথম বিজ্ঞাপন।

নামকরা পত্রিকায় গুরুগম্ভীর ভাষায় রীতিমত জাঁকজমক করে বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি বাজারে সে বই মোটেই বিক্রি হয় নি সেদিন। প্রথম বইতেই বঙ্কিমকে যথেষ্ট মার খেতে হয়েছিল। বইয়ের অন্তর্গত রচনা পরবর্তী কালে তাঁর অন্য গ্রন্থে সংকলিত হলেও ললিতা—পুরাকালিক গল্প—তথা মানস বইটি স্বনামে কোনোদিন আর পুনর্মুদ্রিত হয়ে বাজারে বেরোয় নি।

বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে এই বইটি সম্বন্ধে বলেছেন, "যখন আমি কালেজের ছাত্র, তখন উহা প্রথম প্রচারিত হয়। পড়িয়া উহার দুরূহতা দেখিয়া আমার একজন অধ্যাপক বলিয়াছিলেন—ওগুলি হিয়ালি। অধ্যাপক মহাশয় অন্যায় কথা বলেন নাই। ঐ প্রথম সংস্করণ এখন আর পাওয়া যায় না—অনেক কপি আমি স্বয়ং নষ্ট করিয়াছিলাম।"

এই বইটি যে একেবারেই বিক্রি হয় নি তা বঙ্কিমের নিজের একটি মন্তব্য থেকেও জানতে পারি। বঙ্কিম বলেছেন, "এই কবিতাগুলি লেখকের পঞ্চদশ বৎসর বয়সে লিখিত হয়। লিখিত হওয়ার তিন বৎসর পর মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হইয়া বিক্রেতার আলমারিতেই পচে—বিক্রয় হয় নাই।"

জীবৎকালে বঙ্কিমের যে বইটি সব চেয়ে বেশি ছাপা হয়েছিল—সেটি তাঁর দ্বিতীয় পুস্তক বা প্রথম উপন্যাস দুর্গেশনন্দিনী। দুর্গেশনন্দিনীর প্রকাশ আর বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের মধ্যে উনত্রিশ বৎসরকাল কাটে। এই উনত্রিশ বৎসরের মধ্যে দুর্গেশনন্দিনীর তেরোটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল।

সে-যুগের লোকসংখ্যা আজকের মত ছিল না, ফলে পাঠকের সংখ্যা ছিল তুলনায় অনেক কম। তেরো সংস্করণে দুর্গেশনন্দিনীর মোট বিক্রয় সংখ্যা ছিল বারো হাজার পাঁচশো। এর মধ্যে একটি সংস্করণে একবার

দু হাজার কপি ছাপা হয়েছিল।

১৮৮৮-র মার্চ মাসে দুর্গেশনন্দিনীর একাদশ সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বই ছাপা হয়ে ঘরে এলে বঙ্কিম বলেছিলেন, "এই পুস্তকখানির লোকে যত নিন্দা করিয়াছে তত আর কোনো পুস্তকের করে নাই ; তাই এ পুস্তকের বিক্রি বেশি।"

কপালকুণ্ডলা দুর্গেশনন্দিনীর ঠিক পরের বছর প্রকাশিত হয়, কিন্তু দুর্গেশনন্দিনীর মত বাজার কপালকুণ্ডলা পায় নি। আটাশ বছরে তার আটটি মাত্র সংস্করণ হয়। কপালকুণ্ডলার তিন বছর পর বেরোয় মৃণালিনী। পঁচিশ বছরে মৃণালিনীর দশটি সংস্করণ ছাপা হয়। অর্থাৎ কপালকুণ্ডলার পরে বেরিয়েও মৃণালিনীর সংস্করণ সংখ্যা বেশি।

১৮৭২ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত মাসিকপত্র বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকে বঙ্কিমের ধারাবাহিক সামাজিক উপন্যাস বিষবৃক্ষের সূত্রপাত। ইংরেজি রাজমোহনস্ ওয়াইফের কথা বাদ দিলে বিষবৃক্ষই বঙ্কিমের প্রথম সাময়িকপত্রে প্রকাশিত উপন্যাস। একটি জনপ্রিয় সাময়িকপত্রে কোনো রচনা ধারাবাহিকতা লাভ করলে স্বভাবতই সে লেখা বহুজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে মাসিক বঙ্গদর্শন আসতো নিয়মিত। এই বঙ্গদর্শনের পাতাতেই রবীন্দ্রনাথ বিষবৃক্ষ উপন্যাসটি পাঠ করেছিলেন প্রথম— তখন তাঁর নিতান্তই বালক বয়স। ছেলেবেলা বইটিতে রবীন্দ্রনাথ সেদিনকার কথা লিখে গেছেন।

"তখন বঙ্গদর্শনের ধুম লেগেছে—সূর্যমুখী আর কুন্দনন্দিনী আপন লোকের মত আনাগোনা করছে ঘরে ঘরে। কী হল. কী হবে, দেশসুদ্ধ সবার এই ভাবনা। বঙ্গদর্শন এলে পাড়ায় দুপুর বেলায় কারো ঘুম থাকত না। আমার সুবিধে ছিল, কাড়াকাড়ি করবার দরকার হত না —কেননা, আমার একটা গুণ ছিল—আমি ভালো পড়ে শোনাতে পারতুম।"

বিষবৃক্ষ বই হয়ে বেরলেও শিক্ষিতমহলে যথেষ্ট আলোড়ন তোলে।

এই বইয়ের সমালোচনা করতে গিয়ে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রের সমালোচক লিখেছিলেন—বিগত সমগ্র বৎসর ব্যাপী এই উপন্যাসখানি প্রত্যেক বাঙালীবাবুর বৈঠকখানায় লক্ষ্য করা গেছে।

গ্রন্থাকারে বিষবৃক্ষের প্রকাশ ও গ্রন্থকারের তিরোধানের মধ্যে একুশ বছর কাটে। এই সময়ের মধ্যে বিষবৃক্ষের আটটি সংস্করণ ছাপা হয়।

বিষবৃক্ষ থেকে বঙ্কিমের সকল উপন্যাসই প্রথমে সাময়িকপত্রে মুদ্রিত ও পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

বিষবৃক্ষের পর ইন্দিরা যুগলাঙ্গুরীয় চন্দ্রশেখর রাধারাণী রজনী প্রভৃতি উপন্যাস ছাপা হয়ে বেরতে থাকে। ইন্দিরার একুশ বছরে পাঁচটি সংস্করণ, যুগলাঙ্গুরীয়ের কুড়ি বছরে পাঁচ, চন্দ্রশেখরের উনিশ বছরে তিন, রাধারাণীর উনিশ বছরে চার, রজনীর সতেরো বছরে তিন, কৃষ্ণকান্তের উইলের ষোলো বছরে চার, রাজসিংহের বারো বছরে চার, আনন্দমঠের বারো বছরে পাঁচ, দেবী চৌধুরাণীর দশ বছরে ছয়, এবং সীতারামের সাত বছরে তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

উপন্যাসের নাম	প্রকাশ কাল	গ্রন্থপ্রকাশ ও বঙ্কিমের মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়	মোট সংস্করণ
দুর্গেশনন্দিনী	১৮৬৫	২৯	১৩
কপালকুণ্ডলা	১৮৬৬	২৮	৮
মৃণালিনী	১৮৬৯	২৫	১০
বিষবৃক্ষ	১৮৭৩	২১	৮
ইন্দিরা	১৮৭৩	২১	৫
যুগলাঙ্গুরীয়	১৮৭৪	২০	৫
চন্দ্রশেখর	১৮৭৫	১৯	৩
রাধারাণী	১৮৭৫	১৯	৪
রজনী	১৮৭৭	১৭	৩
কৃষ্ণকান্তের উইল	১৮৭৮	১৬	৪

উপন্যাসের নাম	প্রকাশ কাল	গ্রন্থপ্রকাশ ও বঙ্কিমের মৃত্যুর মধ্যবর্তী সময়	মোট সংস্করণ
রাজসিংহ	১৮৮২	১২	৪
আনন্দমঠ	১৮৮২	১২	৫
দেবী চৌধুরাণী	১৮৮৪	১০	৬
সীতারাম	১৮৮৭	৭	৩

গাণিতিক হিসা [illegible] নিরূপণ করলে দেখা যায় দেবী চৌধুরাণী ছিল তাঁর জীবৎকালের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় উপন্যাস। এই গ্রন্থের মাত্র দশ বছরে ছয়টি সংস্করণ হয়। অপরদিকে তাঁর জীবৎকালে সবচেয়ে অনাদৃত উপন্যাসটি হল চন্দ্রশেখর। দীর্ঘ উনিশ বৎসর কালের মধ্যে এই গ্রন্থের মাত্র তিনটি সংস্করণ বেরিয়েছিল। বর্ষভিত্তিক সংস্করণের হিসাবের মাপকাঠিতে বঙ্কিমের উপন্যাসের জনপ্রিয়তা ক্রমানুসারে নীচে উল্লেখ করা গেল—

উপন্যাসের নাম		জনপ্রিয়তার স্থান
দেবী চৌধুরাণী	—	প্রথম
দুর্গেশনন্দিনী	—	
সীতারাম	—	তৃতীয়
আনন্দমঠ	—	চতুর্থ
মৃণালিনী	—	পঞ্চম
বিষবৃক্ষ		
রাজসিংহ		সপ্তম
কপালকুণ্ডলা		
যুগলাঙ্গুরীয়		নবম
কৃষ্ণকান্তের উইল		নবম
ইন্দিরা		দশম
রাধারাণী		একাদশ

উপন্যাসের নাম		জনপ্রিয়তার স্থান
রজনী	—	দ্বাদশ
চন্দ্রশেখর	—	ত্রয়োদশ

নূতন মুদ্রণ প্রকাশকালে বঙ্কিম তাঁর উপন্যাসের প্রচুর সংশোধন করতেন—কখনো পরিবর্ধন কখনো পরিবর্জন। উপন্যাসের আয়তন বৃদ্ধি পেলে অনুপাতে বইয়ের দামও বাড়তো। রাধারাণীর চতুর্থ সংস্করণের দুই ছত্রের নিবেদনে বঙ্কিম লেখেন, "এই ক্ষুদ্র উপন্যাসের দোষ সংশোধন করিতে গিয়া, ইহার কলেবর বাড়াইতে হইয়াছে। কাজেই মূল্যও বাড়াইতে হইয়াছে।"

সীতারামের তৃতীয় সংস্করণ লেখকের জীবৎকালেই মুদ্রিত, তবে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর কয়েকদিন মাত্র পরে প্রকাশিত হয়। এই কারণে সীতারামের তৃতীয় সংস্করণকে গ্রন্থকারের জীবৎকালের মধ্যে প্রকাশিত বলেই গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ এই সংস্করণের সব কাজকর্ম তিনি নিজেই করে গিয়েছিলেন।

ইন্দিরা রাধারাণী রাজসিংহ ছোট থেকে বড় হয়েছিল, সীতারাম সংশোধনের পর বড় থেকে ছোট হয়। গ্রন্থের পৃষ্ঠাসংখ্যা হ্রাস পাওয়ায় বইয়ের দামও বঙ্কিম কমিয়ে দেন। সীতারামের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিম লেখেন, "সীতারামের কিয়দংশ পরিত্যক্ত এবং কিয়দংশ পরিবর্তিত হইল। গ্রন্থের আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র হইল, এজন্য ইহার দামও কমানো গেল।"

বঙ্কিমচন্দ্রের বইপত্রের কোন্‌টির কি-রকম দাম ছিল?

১৮৭৯ সালে প্রবন্ধ পুস্তক নামে তাঁর একটি নিবন্ধ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। সেই বইয়ের শেষে তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থগুলির দাম একসঙ্গে পাই। উপন্যাসের ক্ষেত্রে তখনও অবশ্য তাঁর রাজসিংহ বা পরবর্তী উপন্যাসগুলি বেরোয় নি—তবে কৃষ্ণকান্তের উইল পর্যন্ত প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে।

১৮৭৯-তে বঙ্কিমচন্দ্রের বইপত্রের দাম ছিল এই প্রকার—

উপন্যাস: দুর্গেশনন্দিনী—এক টাকা চার আনা; কপালকুণ্ডলা

—এক টাকা; মৃণালিনী—এক টাকা দুই আনা; বিষবৃক্ষ—এক টাকা দুই আনা; চন্দ্রশেখর—এক টাকা দুই আনা; রজনী—বারো আনা; কৃষ্ণকান্তের উইল—এক টাকা দুই আনা; উপকথা (ইন্দিরা যুগলাঙ্গুরীয় রাধারাণী একত্রে)—আট আনা।

কবিতা: কবিতা পুস্তক—দশ আনা।

প্রবন্ধ: প্রবন্ধ পুস্তক—চৌদ্দ আনা; বিজ্ঞানরহস্য—দশ আনা; বিবিধ সমালোচন—বারো আনা; সাম্য—ছয় আনা; কমলাকান্তের দপ্তর—বারো আনা; লোকরহস্য—বারো আনা।

১৮৭৯ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের যখন এতগুলি বই বাজারে, ঠিক সেই সময় সাহিত্যের দরবারে একজন নবীন লেখক একখানি নূতন প্রকাশিত পুস্তক হাতে নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। লেখকটির নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বইয়ের শিরোনাম কবি-কাহিনী। তিপ্পান্ন পৃষ্ঠার কবি-কাহিনীর দাম ছিল ছয় আনা; বঙ্কিমের প্রথম বই ললিতারও দাম ছিল ছয় আনা, পৃষ্ঠাসংখ্যা ছিল একচল্লিশ। রবীন্দ্রনাথের কবি-কাহিনী আর বঙ্কিমের কবিতা পুস্তক একই বছরে বেরিয়েছিল—১৮৭৮ সালে। কবিতা পুস্তকের পৃষ্ঠাসংখ্যা একশো বাইশ, দাম ছিল কবি-কাহিনীর থেকে এক সিকি বেশি।[১]

বঙ্গদর্শন পত্রিকার একেবারে শেষ সংখ্যায়, ১২৯০ বঙ্গাব্দের (১৮৮৪ খ্রী) মাঘ সংখ্যায় পাতলা লাল মলাটের দ্বিতীয় পাতায় বঙ্কিমের বইপত্রের যে বিজ্ঞাপনটি বেরোয় তা লক্ষ্য করবার মত। কোনো কোনো গ্রন্থাগারে বঙ্গদর্শনের বাঁধানো ফাইল পাওয়া গেলেও পত্রিকার সব কয়টি সংখ্যার কভার হাজার মাথা খুঁড়লেও পাওয়া কঠিন। আমার নিজের কাছে বঙ্কিমের স্বহস্ত-স্বাক্ষরিত বঙ্গদর্শনের যে সম্পূর্ণ ফাইলটি আছে তাতে অপর কোনো কোনো সংখ্যার সঙ্গে শেষ সংখ্যাটির প্রচ্ছদ অক্ষত অবস্থায় পেয়েছি। এই প্রচ্ছদের দ্বিতীয়

১ দ্রষ্টব্য, বর্তমান লেখকের 'গত শতকে রবীন্দ্রনাথের বইয়ের বাজার', শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৮৮।

পাতায় মুদ্রিত বিজ্ঞাপনটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল। এই বিজ্ঞাপন থেকে দেখা যাবে সে-সময় কোনো কোনো প্রকাশক বঙ্কিমের বিনা অনুমতিতে তাঁর বই ছাপিয়ে বাজারে ছেড়েছিল। এভাবে বইপত্র ছাপা হওয়া মানেই বুঝতে হবে সে-সময় বঙ্কিমের ডিম্যাণ্ড ছিল খুবই বেশি— নইলে কখনো কেউ জাল করে বই ছাপে!

বিজ্ঞাপনটি এই—

বিজ্ঞাপন।

বঙ্কিমবাবুর প্রণীত পুস্তকসকল নিম্নলিখিত স্থানে বিক্রয় হয়:—

সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি, বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট্ কলিকাতা। ক্যানিং লাইব্রেরী, পটলডাঙ্গা, ঐ। পদ্মচন্দ্র নাথের দোকান—চিনাবাজার, ঐ। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের মেডিক্যাল লাইব্রেরী ৯৭ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, ঐ। রাজেন্দ্রনাথ রায় ৯২ নং বহুবাজার, ঐ।

মূল্য নিম্নলিখিত মত

দুর্গেশনন্দিনী—এক টাকা দুই আনা, কপালকুণ্ডলা—এক টাকা, মৃণালিনী—এক টাকা, বিষবৃক্ষ—এক টাকা দুই আনা, চন্দ্রশেখর—এক টাকা দুই আনা, রজনী—দশ আনা, কৃষ্ণকান্তের উইল—চোদ্দ আনা, উপকথা (ইন্দিরা যুগলাঙ্গুরীয় ও রাধারাণী একত্রে)—আট আনা, কমলাকান্তের দপ্তর—ছয় আনা, বিবিধ সমালোচন—বারো আনা, লোকরহস্য—চার আনা, বিজ্ঞান রহস্য—ছয় আনা, কবিতা পুস্তক—দশ আনা, প্রবন্ধ পুস্তক—চোদ্দ আনা, রাজসিংহ—আট আনা, আনন্দমঠ—এক টাকা দুই আনা।

সতর্ক করা যাইতেছে

যে বঙ্কিমবাবুর পুস্তকের উপর তাঁহার স্বাক্ষর থাকে। যাহাতে তাঁহার স্বাক্ষর নাই, কিংবা সঞ্জীববাবুর স্বাক্ষর নাই তাহা বিনানুমতিতে মুদ্রিত; এরূপ কোন পুস্তক, কোন দোকানে পাইলে, তাহা আমরা ধৃত করিব।

এরূপ পুস্তকের যে সন্ধান দিবে, বহি ধরা পড়িলে, তাহাকে ধৃত পুস্তকের মূল্যের উপর শতকরা দশ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে।

বঙ্কিমবাবুর স্বাক্ষরের একটি মোহর চুরি গিয়াছে। কোন পুস্তকের উপর যদি মোহর থাকে, তবে সে পুস্তক চোরাই, ক্রেতাদিগকে সতর্ক করা গেল॥

শুধু গ্রন্থ রচনা নয়, গ্রন্থ প্রকাশনার কাজেও বঙ্কিমের যথেষ্ট আগ্রহ ও তৎপরতা ছিল। অনেক সময় নিজেই বইয়ের প্রুফ দেখতেন। শুধু ভালো বই লিখলেই চলবে না, ঊনবিংশ শতকে বাংলা বইয়ের ভালো প্রোডাক্‌সনও হওয়া দরকার। এ-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন।

১৮৮৮-র ১৩ জুন কলকাতার ৫ নং প্রতাপ চাটুজ্যের গলি থেকে ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে বঙ্কিম যে চিঠি লেখেন তার থেকে কিছু প্রাসঙ্গিক অংশ পরিশেষে তুলে দিলাম—

"পুস্তকগুলি যেরূপ বাজারে বিক্রয় হয়, সেইরূপ বাঁধানোই আপনাকে পাঠানো হইয়াছে, ভালো করিয়া বাঁধানো হয় নাই। সকল-গুলি, এক রকম বাঁধানো, এবং বাঁধানো ইহার অপেক্ষা ভালো হয়, এই-রূপ করিয়া বাঁধাইয়া পাঠাইবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু বাঁধানো পুস্তক আবার বাঁধাইতে গেলে ছোট মার্জিন আরও ছাঁটা পড়িয়া যাইবে এবং আবাঁধা পুস্তক এক সেট পুরা হয় না, এজন্য যেমন ছিল, তেমনি পাঠাইতে বাধ্য হইয়াছি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা গ্রন্থেরও একটু বাহ্য সৌষ্ঠব চাই, এজন্য পুস্তকগুলি সোনার জলে এবং কাপড়ে বাঁধাইয়া বিক্রয় করিয়া থাকি।"

উপন্যাসের বর্জিত কাহিনী

"মত পরিবর্তন, বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার এবং ভাবনার ফল। যাঁহার কখন মত পরিবর্তন হয় না, তিনি হয় অভ্রান্ত দৈবজ্ঞানবিশিষ্ট, নয় বুদ্ধিহীন এবং জ্ঞানহীন।" —বঙ্কিমচন্দ্র

পাঠকের চাহিদা ও রসপিপাসা মেটাবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের জীবিত-কালেই তাঁর প্রত্যেকটি উপন্যাসের অনেকগুলি মুদ্রণ বা সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নতুন সংস্করণ প্রকাশের সময় লেখকের কাছে পুরনো সংস্করণের কাহিনী মনোমত বোধ না হওয়ায় নতুন মুদ্রণে সে কাহিনীর বিচিত্র রূপান্তর সংঘটিত হয়। এর ফলে এমন হয়েছে যে, গল্পের নায়ক কোথাও মৃত্যুর কবল থেকে পুনরায় নতুন জীবন লাভ করেছে, আবার কোথাও হতভাগ্য নায়ক বা নায়িকার আয়ু অকালে নিঃশেষিত হয়ে গেছে। যে কাহিনী একদিন বঙ্কিমচন্দ্রের হাত থেকে প্রথম বেরিয়েছিল, যা পাঠ করে বাংলা দেশের পাঠক-পাঠিকা একদিন রোমাঞ্চিত ও উৎকণ্ঠিত হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের সেই চমকপ্রদ বিস্মৃত কাহিনীর কিছু পরিচয় এখানে দেওয়া গেল।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের নবকুমারের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত। সে পরোপকারী, সাহসী ও বলিষ্ঠ প্রকৃতির মানুষ। উপন্যাসের এই নবকুমারকে শক্তিশালী কাপালিক বধ করতে পারেনি সত্য, কিন্তু নতুন সংস্করণ প্রকাশের সময় ঔপন্যাসিকের সূক্ষ্মতম রচনা সংশোধনের ফলে সেই নবকুমার মৃত্যুর অন্ধকার দ্বারে এসে উপস্থিত হয়।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের শেষ অংশে আমরা এখন কি বিবরণ পাই? বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনা—

"নবকুমার ক্ষিপ্তের ন্যায় কহিলেন, 'চৈতন্য হারাইয়াছি, কি জিজ্ঞাসা করিব—বল—মৃণ্ময়ি! বল—বল—বল—আমায় রাখ।—গৃহে চল।'

কপালকুণ্ডলা কহিলেন, 'যাহা জিজ্ঞাসা করিলে, বলিব। আজি যাহাকে দেখিয়াছ—সে পদ্মাবতী। আমি অবিশ্বাসিনী নহি। এ কথা স্বরূপ বলিলাম। কিন্তু আর আমি গৃহে যাইব না। ভবানীর চরণে

দেহ বিসর্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না।'

'না—মৃণ্ময়ি! —না!—' এইরূপ উচ্চ শব্দ করিয়া নবকুমার কপালকুণ্ডলাকে হৃদয়ে ধারণ করিতে বাহু প্রসারণ করিলেন। কপালকুণ্ডলাকে আর পাইলেন না। চৈত্রবায়ুতাড়িত এক বিশাল তরঙ্গ আসিয়া, তীরে যথায় কপালকুণ্ডলা দাঁড়াইয়া, তথায় তটাধোভাগে প্রহত হইল ; অমনি তটমৃত্তিকাখণ্ড কপালকুণ্ডলা সহিত ঘোররবে নদীপ্রবাহমধ্যে ভগ্ন হইয়া পড়িল। নবকুমার তীরভঙ্গের শব্দ শুনিলেন, কপালকুণ্ডলা অন্তর্হিত হইল দেখিলেন। অমনি তৎপশ্চাৎ লম্ফ দিয়া জলে পড়িলেন। নবকুমার সন্তরণে নিতান্ত অক্ষম ছিলেন না। কিছুক্ষণ সাঁতার দিয়া কপালকুণ্ডলার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে পাইলেন না, তিনিও উঠিলেন না।"

কপালকুণ্ডলা যখন প্রথম প্রকাশিত হয় তখন কিন্তু ঠিক এ কাহিনী ছিল না। সেখানে দেখা যাচ্ছে, নবকুমারের জীবিতাবস্থাতেই উপন্যাসের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। উপন্যাসের শেষ অংশটি ছিল এইরূপ—

"কাপালিক আসনে বসিয়া দেখিলেন, ইহাদের প্রত্যাগমনের সময় অতীত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা বাটী প্রত্যাগমন করিলেন, কি কি, এই আশঙ্কায় কাপালিক আসন ত্যাগ করিয়া শ্মশানভূমির উপর দিয়া কূলে গমন করিলেন। কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণেক পরে জলমধ্যে কোন পদার্থ ভাসিয়া ডুবিল দেখিলেন—বোধ হইল, যেন মনুষ্যমস্তক মনুষ্যহস্ত। লম্ফ দিয়া অনায়াসে দৃষ্ট পদার্থ কূলে তুলিলেন। দেখিলেন, এ নবকুমারের প্রায় অচৈতন্য দেহ। অনুভবে বুঝিলেন কপালকুণ্ডলাও জলমগ্না আছেন। পুনরপি অবতরণ করিয়া তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন, কিন্তু তাঁহাকে পাইলেন না।

তীরে পুনরারোহণ করিয়া কাপালিক নবকুমারের চৈতন্যবিধানের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। নবকুমারের সংজ্ঞালাভ হইবামাত্র, নিশ্বাস সহকারে বাক্যস্ফূর্তি হইল। সে বাক্য কেবল—মৃণ্ময়ি! মৃণ্ময়ি!

কাপালিক জিজ্ঞাসা করিলেন, মৃণ্ময়ী কোথায়? নবকুমার উত্তর করিলেন, মৃণ্ময়ি—মৃণ্ময়ি—মৃণ্ময়ি!”

এখন প্রশ্ন, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসে কেন এমন পরিবর্তন করলেন? কাপালিক কর্তৃক জল থেকে উদ্ধারের পর যে অচৈতন্য নবকুমারের পুনরায় চেতনা ফিরে এসেছিল, সেই নবকুমারকে পরবর্তীকালে ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র বায়ু-বিক্ষিপ্ত গঙ্গাপ্রবাহের মধ্য থেকে কেন উদ্ধার করে আনলেন না? কাপালিকই বা এবার উদ্ধারকার্যে এগিয়ে এল না কেন?

বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের মূল কাহিনীর কেন পরিবর্তন করলেন, এর কিছু কারণ অনুমান করা যেতে পারে। কপাল-কুণ্ডলা উপন্যাসের প্রথম কাহিনীতে ছিল কাপালিক জলের মধ্যে নবকুমারকে দেখতে পেয়ে ‘লম্ফ দিয়া অনায়াসে দৃষ্ট পদার্থ কূলে তুলিলেন’। কিন্তু সত্যিই কি কাপালিকের পক্ষে এ কাজ করা সম্ভবপর ছিল; কারণ বঙ্কিমচন্দ্রই উপন্যাসের মধ্যে পাঠককে এক স্থানে সম্বোধন করে বলেছেন, “পাঠক মহাশয়ের স্মরণ থাকিতে পারে যে, যে রাত্রে কপালকুণ্ডলার সহিত নবকুমার সমুদ্রতীর হইতে পলায়ন করেন, সেই রাত্রে তাঁহাদিগের অন্বেষণ করিতে করিতে কাপালিক বালিয়াড়ির শিখর-চ্যুত হইয়া পড়িয়া যান। পতনকালে দুই হস্তে ভূমি ধারণ করিয়া শরীর রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন; তাহাতে শরীর রক্ষা হইল বটে, কিন্তু দুইটি হস্ত ভাঙ্গিয়া গেল।” আর কাপালিকের নিজের উক্তি, “বাহুদ্বারা নিত্যক্রিয়া সকল নির্বাহের কোন বিশেষ বিঘ্ন হয় না। কিন্তু ইহাতে আর কিছুমাত্র বল নাই। এমন কি ইহার দ্বারা কাষ্ঠাহরণে কষ্ট হয়।” যে বাহু কাষ্ঠাহরণে অক্ষম সে বাহুর পক্ষে গঙ্গায় নিমজ্জিত কোনো মনুষ্যকে ‘অনায়াসে’ কূলে তুলে আনা কি প্রকারে সম্ভব? এই অসঙ্গতির দিকটি হয়তো তৎকালের কোনো পাঠক লেখকের নজরে আনে কিংবা এই ক্রটিটি বঙ্কিম নিজেই লক্ষ্য করেছিলেন এবং পরবর্তীকালে নতুন সংস্করণ প্রকাশের সময় তা সংশোধন করে দেন।

বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলার কাহিনী কেন পরিবর্তন করলেন সে বিষয়ে আরও একটি গুরুতর কারণ অনুমান করা যেতে পারে। বঙ্কিমের কপালকুণ্ডলা প্রথম মুদ্রিত হয় ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। এর আট বছর পরে ঔপন্যাসিক দামোদর মুখোপাধ্যায় 'মৃণ্ময়ী' নামে কপালকুণ্ডলার উপসংহার ভাগ রচনা করেন। অর্থাৎ কপালকুণ্ডলার পূর্বের কাহিনী যেখানে শেষ —নবকুমারের উদ্ধার ও চেতনা লাভের মধ্যে; মৃণ্ময়ী উপন্যাসের সূত্রপাত সেখান থেকেই। আজ থেকে এক শ' বছর আগের বাঙালী পাঠক সেদিনের সদ্যপ্রকাশিত কপালকুণ্ডলা পাঠ করে অনুভব করেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র অনতিবিলম্বে এ উপন্যাসের একখানি দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশ করবেন। কারণ, নবকুমারের পত্নী কপালকুণ্ডলা গঙ্গার জলে নিজেকে বিসর্জন দিলেও জীবিত অবস্থায় উপন্যাস-মঞ্চে দু'টি প্রধান চরিত্র নবকুমার ও তার পূর্ব পত্নী পদ্মাবতী বর্তমান। সুতরাং এদের জীবনের পরিণতি কি ? গল্পের শেষ কোথায় ?

১৮৬৬ থেকে ১৮৭৪—অর্থাৎ আট বছর কেটে গেল, এর মধ্যে উপন্যাসের তিনটি মুদ্রণ প্রকাশিত হল, কিন্তু নবকুমার-পদ্মাবতী জীবনের নতুন কি ইতিহাস গড়ে উঠতে পারে সে কথা বঙ্কিমচন্দ্র আর জানালেন না। সেই সুযোগ নিয়ে পাঠকের কৌতূহল ও আগ্রহ চরিতার্থ করলেন দামোদর ১৮৭৪-রেই মৃণ্ময়ী উপন্যাস রচনা করে। এর পর এক সময় এমন দাঁড়ালো যে, সেকালের পাঠকের কাছে কপালকুণ্ডলা অপেক্ষা মৃণ্ময়ী উপন্যাসের কাহিনী অনেক বেশি জনপ্রিয় হয়ে উঠল। ১৮৭৪—বঙ্কিম সে সময় শুধু দুর্গেশনন্দিনী বা কপালকুণ্ডলার রচয়িতা নন, এর মধ্যে তাঁর বিখ্যাত মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয় উপন্যাস প্রকাশিত হয়ে গেছে ; কিন্তু মৃণ্ময়ীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কপালকুণ্ডলা কিছুটা নিষ্প্রভ, জনপ্রিয়তায় মৃণ্ময়ী কপালকুণ্ডলা অপেক্ষা উজ্জ্বলতর।

সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রকে চিন্তা করতে হল ; এবং তার পরেই কপাল-কুণ্ডলা উপন্যাসের পরিণতির এক আশ্চর্য নাটকীয় পরিবর্তন। নবকুমার ও কপালকুণ্ডলা—উভয়েই অনন্ত গঙ্গার চৈত্রবায়ুবিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার

মধ্যে কোথায় অন্তর্হিত হল, তাদের উদ্ধারের জন্য গঙ্গার কূলে আশঙ্কিত কাপালিকের আর আবির্ভাব ঘটল না। এরপর মৃত নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার কাহিনী নিয়ে দামোদরের মৃণ্ময়ী সাহিত্যের বাজারে আর তেমন চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করতে পারল না।

কপালকুণ্ডলায় যেমন নবকুমারের আকস্মিক মৃত্যু; বঙ্কিমের কৃষ্ণকান্তের উইলের নতুন সংস্করণে নায়ক গোবিন্দলালের মৃত্যুর কবল থেকে তেমনি আকস্মিক পুনর্জন্ম প্রাপ্তি ঘটে। কৃষ্ণকান্তের উইলের প্রথম সংস্করণের গল্পের শেষ অংশে ছিল—

"গোবিন্দলাল উঠিলেন। উদ্যান হইতে অবতরণ করিয়া বারুণীর ঘাটে আসিলেন। বারুণীর ঘাটে আসিয়া সোপান অবতরণ করিলেন। সোপান অবতরণ করিয়া জলে নামিলেন। জলে নামিয়া স্বর্গীয় সিংহাসনারূঢ়া জ্যোতির্ময়ী ভ্রমরের মূর্তি মনে মনে কল্পনা করিতে করিতে ডুব দিলেন।

পরদিন প্রভাতে, যেখানে সাত বৎসর পূর্বে তিনি রোহিণীর মৃতবৎ দেহ পাইয়াছিলেন, সেইখানে তাঁহার মৃতদেহ পাওয়া গেল।"

কিন্তু পরে যখন নতুন সংস্করণ প্রকাশিত হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তখন গোবিন্দলালকে আবার জীবিত করে তুললেন। কৃষ্ণকান্তের উইলের যে কাহিনীর সঙ্গে আমরা আজ পরিচিত সেই অংশ—

"গোবিন্দলাল চক্ষু বুজিলেন। তাঁহার শরীর অবসন্ন বেপমান হইল। তিনি মূৰ্ছিত হইয়া সোপানশিলার উপরে পতিত হইলেন।...

গোবিন্দলাল সে রাত্রে মূর্ছিত অবস্থায় সেইখানে পড়িয়া রহিলেন। প্রভাতে সন্ধান পাইয়া তাঁহার লোকজন তাঁহাকে তুলিয়া গৃহে লইয়া গেল। তাঁহার দুরবস্থা দেখিয়া মাধবীনাথেরও দয়া হইল। সকলে মিলিয়া তাঁহার চিকিৎসা করাইলেন। দুই-তিন মাসে গোবিন্দলাল প্রকৃতিস্থ হইলেন। সকলেই প্রত্যাশা করিতে লাগিলেন, তিনি এক্ষণে গৃহে বাস করিবেন। কিন্তু গোবিন্দলাল তাহা করিলেন না। এক রাত্রি তিনি কাহাকে কিছু না বলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন। কেহ

আর তাঁহার কোন সংবাদ পাইল না।"

এরই বার বৎসর পরে পরিপূর্ণ সন্ন্যাসীরূপে গোবিন্দলাল ক্ষণকালের জন্য একবার হরিদ্রাগ্রামে ফিরে এসেছিলেন, তারপর আর কোনদিন তাঁকে দেখতে পাওয়া গেল না।

বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করতেন মৃত্যু মানুষের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত নয়; বরং মৃত্যু এক প্রকার মুক্তি এক প্রকার শাস্তি। ভ্রমর মরণের মধ্য দিয়ে সেই শাস্তি লাভ করেছিল; গোবিন্দলাল মৃত্যুর সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে বাকি জীবন স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে চললেন।

আত্মহত্যা

"কুন্দনন্দিনীকে দিয়ে বিষ খাইয়ে আমি অন্য মেয়েদের বিষ খাওয়ার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছি, সেই অনুতাপে আমি দগ্ধ হচ্ছি। সেই দৃষ্টান্ত প্রথমেই অনুসরণ করে আমার মেয়ে।" —বঙ্কিমচন্দ্র

বিধবা রোহিণী গোপনে মেজবাবু গোবিন্দলালের প্রতি প্রণয়াসক্ত হয়েই বুঝেছিল যে, এ একেবারেই মরবার কথা। লুকানো প্রেম জীবনভোর বহন করা রোহিণীর পক্ষে একান্তই কষ্টদায়ক হল। সে তখন মনে মনে রাত্রিদিন আন্তরিকভাবে মৃত্যুকামনা করতে লাগল।

বঙ্কিম বলেছেন, "কত লোকে যে মনে মনে মৃত্যুকামনা করে, কে তাহার সংখ্যা রাখে?...মৃত্যুকে ডাকে, কিন্তু কার কাছে মৃত্যু আসে? ডাকিলে মৃত্যু আসে না। যে সুখী, যে মরিতে চায় না, যে সুন্দর, যে যুবা, যে আশাপূর্ণ, যাহার চক্ষে পৃথিবী নন্দনকানন, মৃত্যু তাহারই কাছে আসে। রোহিণীর মত কাহারও কাছে আসে না। এ দিকে মনুষ্যের এমনি শক্তি অল্প যে, মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতে পারে না। একটি ক্ষুদ্র সূচীবেধে, অর্ধবিন্দু ঔষধভক্ষণে, এ নশ্বর জীবন বিনষ্ট হইতে পারে, এ চঞ্চল জলবিম্ব কালসাগরে মিলাইতে পারে—কিন্তু আন্তরিক মৃত্যু কামনা করিলেও প্রায় কেহ ইচ্ছাপূর্বক সে সূচ ফুটায় না, সে অর্ধবিন্দু ঔষধ পান করে না। কেহ কেহ তাহা পারে, কিন্তু রোহিণী সে দলের নহে—রোহিণী তাহা পারিল না।"

বঙ্কিমের উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে এই দিক থেকে দুটি পৃথক দলে ভাগ করা যায়। এক দল আন্তরিকভাবে মৃত্যুকে কামনা করলেও স্বেচ্ছায় প্রাণবিসর্জন দিতে পারে না। অপর দল বিষপান করেই হোক বা জলে ডুবেই হোক বা অন্য যে কোনো কৌশলেই হোক—নিজের প্রাণ নিজের হাতে বিনাশ করতে পারে। বঙ্কিমের সৃষ্ট

চরিত্রগুলির মধ্যে এই শেষোক্ত দলে কে কে রয়েছে? এই দলের উল্লেখযোগ্য নর-নারী হল—কপালকুণ্ডলা, নবকুমার, মনোরমা, কুন্দনন্দিনী, দলনী, প্রতাপ এবং ভবানন্দ। এরা যে শুধু মৃত্যুকে কামনা করেছে তাই নয়, এরা মৃত্যুকে নিজেরাই আহ্বান ও বরণ করে নিয়েছে। আর যারা শুধু মৃত্যুকে কামনাই করেছে মাত্র—তাদের দলে রয়েছে আয়েষা, সূর্যমুখী, হীরা, নগেন্দ্র, ভ্রমর, জেবউন্নিসা প্রভৃতি চরিত্র। এ ছাড়াও আরও একটি দল গড়া যেতে পারে, যেখানে চরিত্রগুলি বিষ খেয়ে বা জলে ডুবে মরলেও, তাৎক্ষণিক চিকিৎসা ও ঔষধ প্রয়োগের ফলে তাদের মৃত্যুর দোরগোড়া থেকে ফিরে আসতে হয়েছে এই মর্তালোকে আবার। এই দলে রয়েছে বালক প্রতাপ, রজনা, রোহিণী এবং কল্যাণী।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে কপালকুণ্ডলা গঙ্গার প্রবাহমধ্যে নিমজ্জিত হয়ে আত্মাহুতি দিয়েছিল। একে আত্মাহুতি না বলে আত্মবিসর্জন বলাই সঙ্গত। ব্যক্তিগত কোনো ক্ষোভে বা দুঃখে নয়, নিতান্তই পরের সুখের জন্য বিনা দ্বিধায় সে তার ইহজীবন বিসর্জন দিয়েছিল। লুৎফউন্নিসা কপালকুণ্ডলার কাছে ভিক্ষা চেয়ে বলেছিল—তোমার স্বামীকে ত্যাগ কর। আমার স্বামীকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও। লুৎফউন্নিসার কথা শুনে কপালকুণ্ডলা চিন্তা করতে লাগল। পৃথিবীর সর্বত্র মানসলোচনে দেখল—কোথাও কাউকে দেখতে পেল না। অন্তঃকরণমধ্যে দৃষ্টি করে দেখল—কিন্তু নবকুমারকে কোথাও খুঁজে পেল না। তখন লুৎফউন্নিসাকে কপালকুণ্ডলা বলল, "আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব? তোমার মানস সিদ্ধ হউক—কালি হইতে বিঘ্নকারিণীর কোনো সংবাদ পাইবে না।"

তাই দেখি, সেই রাত্রেই গঙ্গাতীরের সৈকতে শ্মশানভূমিতে নবকুমার যখন কপালকুণ্ডলার পদতলে চীৎকার করে রোদন করতে করতে বলল, "মৃণ্ময়ি!—কপালকুণ্ডলে! আমায় রক্ষা কর। এই তোমার পায়ে লুটাইতেছি—একবার বল যে, তুমি অবিশ্বাসিনী নও—একবার বল,

আমি তোমায় হৃদয়ে তুলিয়া গৃহে লইয়া যাই!" তখন কপালকুণ্ডলা উত্তরে শুধু বলেছিল, "আমি অবিশ্বাসিনী নহি। তার পরেই কপালকুণ্ডলার উক্তি, "কিন্তু আর আমি গৃহে যাইব না। ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব। তুমি গৃহে যাও। আমি মরিব। আমার জন্য রোদন করিও না।" এর পরেই দেখা গেল, কপালকুণ্ডলা সেই চৈত্রবায়ুতাড়িত গঙ্গার বিশাল তরঙ্গমধ্যে অন্তর্হিত হল। নবকুমারও কপালকুণ্ডলার খোঁজে জলে ঝাঁপ দিল। নবকুমার সন্তরণে নিতান্ত অক্ষম ছিল না। কিছুক্ষণ সাঁতার দিয়ে কপালকুণ্ডলার অন্বেষণ করতে লাগল। কপালকুণ্ডলাকে পাওয়া গেল না, নবকুমারও উঠল না।

এখানেই উপন্যাসের সমাপ্তি। এখানে আমাদের বক্তব্য—এই উপাখ্যানে কপালকুণ্ডলার আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে তাঁর চরিত্রের যে মহিমা প্রকাশ পেয়েছে; জল থেকে আর না উঠে আসার মধ্যে দিয়ে নবকুমারের চরিত্রের সে মহিমা কিন্তু কিছুমাত্র প্রকাশ পায় নি। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে কপালকুণ্ডলার মৃত্যুর নাম আত্মোৎসর্গ বা আত্মবিসর্জন; আর নবকুমারের মৃত্যুকে বলা চলে সহমরণ।

এই সহমরণে প্রাণত্যাগ করেছিল মৃণালিনী উপন্যাসের মনোরমা। কিন্তু সে মৃত্যু নবকুমারের মৃত্যু অপেক্ষা মহিমময়। সে মৃত্যু যেমন ভীষণ, তেমনি করুণ এবং তেমনিই চরিত্রোপযোগী।

বিষবৃক্ষ উপন্যাসে সূর্যমুখী, কুন্দনন্দিনী, হীরা, নগেন্দ্র—সকলেই এক-একবার করে মরতে চেয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই উপাখ্যানে নিজের মৃত্যু নিজে ঘটিয়েছে একমাত্র কুন্দনন্দিনী। আর সকলে মৃত্যুকে কোনো না কোনো সময়ে আকাঙ্ক্ষা করেছে মাত্র।

নগেন্দ্র যখন সূর্যমুখীকে বলে, "আমি জানি, তুমি সন্দেহ করিয়াছিলে যে, আমি কুন্দনন্দিনীতে অনুরক্ত।" তখন সূর্যমুখী নগেন্দ্রের পায়ে মুখ লুকিয়ে কেঁদে বলেছিল, "কি বলিব তোমায়? আমি যে দুঃখ পাইয়াছি, তাহা কি তোমায় বলিতে পারি? মরিলে

পাছে তোমার দুঃখ বাড়ে, এই জন্য মরি নাই। নহিলে যখন জানিয়াছিলাম, অন্যা তোমার হৃদয়ভাগিনী—আমি তখন মরিতে চাহিয়াছিলাম। মুখের মরা নহে—যেমন সকলে মরিতে চাহে, তেমন মরা নহে ; আমি যথার্থ আন্তরিক অকপটে মরিতে চাহিয়াছিলাম।”

আন্তরিক অকপটে মরতে চাইলেও এ সংসারে সকলের পক্ষে স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ সম্ভব নয়।

নগেন্দ্রও একদিন সূর্যমুখীর বিরহে কাতর হয়ে মৃত্যুকে আকাঙ্ক্ষা করেছিল। মধুপুরে সূর্যমুখীর সন্ধান করতে এসে যখন শুনল গৃহদাহে তার মৃত্যু হয়েছে তখন নগেন্দ্রের মনে হল—“এত দিনে সব ফুরাইল।” নগেন্দ্র তখন মনে করল, “এ জীবন এই সূর্যমুখীর বধের প্রায়শ্চিত্তে উৎসর্গ করিব।...পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত হয়। দুঃখের ত প্রায়শ্চিত্ত নাই। দুঃখের প্রায়শ্চিত্ত কেবল মৃত্যু। মরিলেই দুঃখ যায়। সে প্রায়শ্চিত্ত না করি কেন ?” তখন চক্ষু হস্তে আবৃত করে জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করে নগেন্দ্রনাথ মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করল।

হীরা কিন্তু সত্যি সত্যিই মরতে চেয়েছিল—বিষ খেয়ে মরতে চেয়েছিল। গোবিন্দপুরে এক চণ্ডাল কবিরাজ বিষবড়ি বিক্রি করত। দেবেন্দ্র যেদিন হীরাকে পদাঘাত করে তাড়িয়ে দিল, হীরা সেদিন বাড়ি না ফিরে সোজা সেই চণ্ডালের কাছে গিয়ে মরবার জন্য তীব্র বিষ সংগ্রহ করল। সে এই বিষ পান করে অপমানের জ্বালা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিল। সে বিষের মোড়ক ঘরে এনে অনেকক্ষণ কাঁদল। পরে চোখ মুছে মনে মনে বলল, “আমি কি দোষে বিষ খাইয়া মরিব ? যে আমাকে মারিল, আমি তাহাকে না মারিয়া আপনি মরিব কেন ? এ বিষ আমি খাইব না। যে আমার এ দশা করিয়াছে, হয় সেই ইহা খাইবে, নহিলে তাহার প্রেয়সী কুন্দনন্দিনী ইহা ভক্ষণ করিবে। ইহাদের এক জনকে মারিয়া, পরে মরিতে হয় মরিব।”

তাই দেখি, যে-বিষ হীরা নিজের জন্য কিনে এনেছিল, সে-বিষ আর তার নিজের খাওয়া হল না। হীরা সেই বিষের মোড়ক কুন্দের হাতে

তুলে দিল। সেই বিষ স্বেচ্ছায় পান করে নবীন যৌবনে কুন্দনন্দিনী প্রাণত্যাগ করল। অপরিস্ফুট কুন্দকুসুম শুকাল।

চন্দ্রশেখর উপন্যাসে দলনী বিষপান করে মরেছে আর প্রতাপ যুদ্ধে গিয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করেছে। এই উপন্যাসে উভয়ের মৃত্যুই অতিশয় মহান এবং গৌরবময়। হিন্দু-পত্নী শৈবলিনী স্বামীকে ত্যাগ করে প্রিয়ের সন্ধানে গৃহছাড়া হয়েছিল; অপরদিকে এই উপন্যাসে দেখি, মুসলমান-পত্নী দলনীবেগম ভারতবর্ষে দ্বিতীয় নুরজাহান হবার লোভকে তুচ্ছজ্ঞান করে স্বামীকে রক্ষা করবার জন্য গোপনে দুর্গ ত্যাগ করেছিল। গুর্‌গণ খাঁ বোনকে বলেছিল, "তুমি কাঁদ কেন? না হয় মীরকাসেম সিংহাসনচ্যুত হইলেন, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া দেশে লইয়া যাইব।" ক্রোধে দলনী বলেছিল, "তুমি কি বিস্মৃত হইতেছ যে, মীরকাসেম আমার স্বামী।" গুর্‌গণ খাঁ কিঞ্চিৎ বিস্মিত কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হয়ে বলল, "না বিস্মৃত হই নাই কিন্তু স্বামী কাহারও চিরকাল থাকে না। এক স্বামী গেলে আর এক স্বামী হইতে পারে। আমার ভরসা আছে, তুমি একদিন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নুরজাহান হইবে।" দলনী এই কথা শুনে ক্রোধে কাঁপতে কাঁপতে গুর্‌গণ খাঁকে বলেছিল, "তুমি নিপাত যাও! অশুভক্ষণে আমি তোমার ভগিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম—অশুভক্ষণে আমি তোমার সহায়তায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম। স্ত্রীলোকের যে স্নেহ, দয়া, ধর্ম আছে, তাহা তুমি জান না। যদি তুমি এই যুদ্ধের পরামর্শ হইতে নিবৃত্ত হও, ভালই; নহিলে আজি হইতে তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ নাই। সম্বন্ধ নাই কেন? আজি হইতে তোমার সঙ্গে আমার শত্রু সম্বন্ধ। আমি জানিব যে, তুমিই আমার পরম শত্রু। তুমি জানিও, আমি তোমার পরম শত্রু। এই রাজান্তঃপুরে আমি তোমার পরম শত্রু রহিলাম।"

এই দলনী যেদিন শুনল যে নবাব মীরকাসেম তার প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে তাকে বিষপান করে মরতে বলেছেন, সেদিন দলনী মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে লাগল। সেই কান্নার মধ্যে দলনীর উক্তি, "ও রাজ-

রাজেশ্বর! শাহান্‌শাহা! বাদশাহের বাদশাহ! এ গরীব দাসীর উপর কি হুকুম দিয়াছ! বিষ খাইব? তুমি হুকুম দিলে, কেন খাইব না? তোমার আদরই আমার অমৃত—তোমার ক্রোধই আমার বিষ—তুমি যখন রাগ করিয়াছ—তখন আমি বিষপান করিয়াছি। ইহার অপেক্ষা বিষে কি অধিক যন্ত্রণা! হে রাজাধিরাজ—জগতের আলো—অনাথার ভরসা—পৃথিবীপতি—ঈশ্বরের প্রতিনিধি—দয়ার সাগর—কোথায় রহিলে? আমি তোমার আদেশে হাসিতে হাসিতে বিষপান করিব—কিন্তু তুমি দাঁড়াইয়া দেখিলে না—এই আমার দুঃখ।"

মহম্মদ তকি এসে দেখল দলনীর সামনে শূন্য বিষের পাত্র। "দলনী ধীরে, ধীরে, শয়ন করিল। চক্ষু বুজিল। সব অন্ধকার হইল। দলনী চলিয়া গেল।" মৃত্যুকে বরণ করে দলনী প্রেমের চরম মূল্য দিয়ে গেল।

আর এই উপাখ্যানে প্রতাপের আত্মবিসর্জন কেবলমাত্র পরের মঙ্গল সাধনের নিমিত্ত। রণাঙ্গনে মুমূর্ষু প্রতাপকে ডেকে রমানন্দ স্বামী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "আমরা নিষেধ করিয়াছিলাম, কেন এ দুর্জয় রণে আসিলে?" উত্তরে প্রতাপ বলে, "শৈবলিনী বলিয়াছিল যে, এ পৃথিবীতে আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ না হয়। আমি বুঝিয়াছিলাম, আমি জীবিত থাকিতে শৈবলিনী বা চন্দ্রশেখরের সুখের সম্ভাবনা নাই। যাহারা আমার পরম প্রীতির পাত্র, যাহারা আমার পরমোপকারী, তাহাদিগের সুখের কণ্টকস্বরূপ এ জীবন আমার রাখা অকর্তব্য বিবেচনা করিলাম। তাই, আপনাদিগের নিষেধ সত্ত্বেও এ সমরক্ষেত্রে, প্রাণত্যাগ করিতে আসিয়াছিলাম। আমি থাকিলে, শৈবলিনীর চিত্ত, কখন না কখন বিচলিত হইবার সম্ভাবনা। অতএব আমি চলিলাম।" রমানন্দ স্বামী আবার প্রশ্ন করলেন, "তুমি শৈবলিনীকে ভালবাসিতে?" এই প্রশ্নে মৃত্যুপথযাত্রী প্রতাপের মুখ অকস্মাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। প্রতাপ বলল, "কি বুঝিবে, তুমি সন্ন্যাসী! এ জগতে মনুষ্য কে আছে যে, আমার এ ভালবাসা বুঝিবে!...পাপচিত্তে আমি তাহার প্রতি অনুরক্ত

নহি—আমার ভালবাসার নাম—জীবনবিসর্জনের আকাঙ্ক্ষা।” এই ভালবাসার মূল্যেই প্রতাপ তার নিজের জীবন বিসর্জন দিতে পেরেছিল অকুণ্ঠিত চিত্তে।

প্রতাপের মত ভবানন্দও যুদ্ধে স্বেচ্ছায় প্রাণত্যাগ করেছিল। আনন্দমঠের সন্তান হয়েও ভবানন্দ ইন্দ্রিয়পরবশ হয়েছিল, কল্যাণীর প্রতি আসক্ত হয়েছিল। এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত ভবানন্দ নিজে নিজেই করেছিল। সত্যানন্দ ভবানন্দকে জানতেন। তাই তিনি জানতেন ভবানন্দ নিজের পাপের প্রায়শ্চিত্ত নিজেই করবে। এর জন্য কোনো নির্দেশ বা আদেশের প্রয়োজন হবে না। সত্যানন্দ ধীরানন্দকে বলেই রেখেছিলেন, “ভবানন্দের কাছে থাকিও, আজ সে মরিবে। মৃত্যুকালে তাহাকে বলিও, আমি আশীর্বাদ করিতেছি, পরলোকে তাহার বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইবে।”

একদিন জেবউন্নিসার মত বাদশাহজাদীও মবারকের শোকে মৃত্যুকে আকাঙ্ক্ষা করেছিল। মৃত্যুকে কামনা করলেও মৃত্যুকে গ্রহণ করবার শক্তি বাদশাহজাদীর ছিল না। সে কথা জেবউন্নিসা নিজেও জানত। জেবউন্নিসা ভাবছিল, “কাল সৈন্যমধ্যে গজপৃষ্ঠে চড়িয়া লক্ষ সৈন্যের শ্রেণী দেখিয়াছিলাম, লক্ষ অস্ত্রের ঝঞ্চনা শুনিয়াছিলাম—তার একখানিতে আমার সব জ্বালা ফুরাইতে পারে; কৈ, সে চেষ্টা ত করি নাই? হাতীর উপর হইতে লাফাইয়া পড়িয়া, হাতীর পায়ের তলে পিষিয়া মরিতে পারিতাম,—কৈ? সে চেষ্টাও ত করি নাই। কেন করি নাই? মরিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু মরিবার উদ্যোগ নাই কেন? এখনও ত অঙ্গে অনেক হীরা আছে, গুঁড়াইয়া খাইয়া মরি না কেন? আমার মনের আর সে শক্তি নাই যে, উদ্যোগ করিয়া মরি।”

আমি প্রবন্ধের প্রথমে বঙ্কিম-সৃষ্ট চরিত্রগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছিলাম। তৃতীয় ভাগে বালক প্রতাপ, রজনী, রোহিণী, কল্যাণী ও মবারককে পাই—এরা মৃত্যুকে বরণ করলেও মৃত্যু এদের বরণ করে নি। পরলোকের পথে যাত্রা করেও এদের পুনরায় ইহলোকে ফিরে আসতে

হয়েছে। মৃত্যুর দ্বারদেশে গিয়েও এরা মানুষের হাতেই আবার জীবন ফিরে পেয়েছে। বালক বালিকা প্রতাপ ও শৈবলিনী দুজনেই জলে ডুবে মরতে গিয়েছিল। প্রতাপ ডুবল। শৈবলিনী ডুবল না—কূলে ফিরে এল। নৌকারোহী চন্দ্রশেখর গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে প্রতাপকে উদ্ধার করল।

এই গঙ্গায় রজনীও ডুবেছিল। রজনীর কথায়, "ডুবিলাম, কিন্তু মরিলাম না।···আমি সেই প্রভাতবায়ুতাড়িত গঙ্গাজলপ্রবাহমধ্যে নিমগ্ন হইয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম। ক্রমে শ্বাস নিশ্চেষ্ট, চেতনা বিনষ্ট হইয়া আসিল।···আমি জলে ডুবিয়া ভাসিয়া উঠিলাম। একখানা গহণার নৌকা যাইতেছিল। সেই নৌকার লোক আমাকে ভাসিতে দেখিয়া উঠাইল।"

রোহিণীও জলে ডুবে মরতে চেয়েছিল; তবে সে গঙ্গায় নয়, বারুণী পুষ্করিণীর গভীর জলতলে। গোবিন্দলাল পুষ্করিণীর ঘাটে এল। "সর্বশেষ সোপানে দাঁড়াইয়া পুষ্করিণীর সর্বত্র দেখিতে লাগিলেন। জল কাচতুল্য স্বচ্ছ। ঘাটের নীচে জলতলস্থ ভূমি পর্যন্ত দেখা যাইতেছে। দেখিলেন, স্বচ্ছ স্ফটিকমণ্ডিত হৈমপ্রতিমার ন্যায় রোহিণী জলতলে শুইয়া আছে। অন্ধকার জলতল আলো করিয়াছে। গোবিন্দলাল তৎক্ষণাৎ জলে নামিয়া ডুব দিয়া, রোহিণীকে উঠাইয়া, সোপান উপরি শায়িত করিলেন। দেখিলেন, রোহিণী জীবিত আছে কি না সন্দেহ; সে সংজ্ঞাহীন; নিশ্বাসপ্রশ্বাসরহিত।" এই রোহিণীকে গোবিন্দলাল বাঁচিয়ে তুলেছিল। "প্রথমে নিশ্বাস, পরে চৈতন্য, পরে দৃষ্টি, পরে স্মৃতি, শেষে বাক্য স্ফুরিত হইতে লাগিল। রোহিণী বলিল—আমি মরিয়াছিলাম, আমাকে কে বাঁচাইল?"

কল্যাণী কন্যার শোকে বিষপান করেছিল। ভবানন্দ তাকে জীবনদান করে উদ্ধার করে। আর মবারকের মৃতদেহ কবরের মাটি থেকে তুলে ঔষধ প্রয়োগের দ্বারা পুনর্জীবিত করে তোলে মাণিকলাল।

বঙ্কিমের উপন্যাসে যারা মৃত্যুকে নিজ হাতে বরণ করে মহান

চরিত্রের অধিকারী হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কপালকুণ্ডলা, মনোরমা, কুন্দনন্দিনী, দলনী ও প্রতাপ। বঙ্কিম কৃষ্ণকান্তের উইলে বলেছিলেন, "আন্তরিক মৃত্যুকামনা করিলেও প্রায় কেহ ইচ্ছাপূর্বক সে সূচ ফুটায় না, সে অর্ধবিন্দু ঔষধ পান করে না। কেহ কেহ তাহা পারে, কিন্তু রোহিণী সে দলের নহে—রোহিণী তাহা পারিল না।" কিন্তু এখানে আমাদের প্রশ্ন 'রোহিণী সে দলের নহে'—বঙ্কিমের এ উক্তি আমরা কেমন করে মানব? আয়েষা, সূর্যমুখী, নগেন্দ্র, ভ্রমর, জেবউন্নিসা—এরা আন্তরিকভাবে মৃত্যুকে আকাঙ্ক্ষা করলেও মৃত্যুকে বরণ করতে পারে নি। বলতে পারি—কপালকুণ্ডলা, মনোরমা, কুন্দনন্দিনী, দলনী, প্রতাপ, ভবানন্দ প্রভৃতি যে দলের, সূর্যমুখী, নগেন্দ্র, চঞ্চলকুমারী, জেবউন্নিসা প্রভৃতি সে দলের নয়। কিন্তু রোহিণী কোন্ দলের? সে তো শুধু মৃত্যুকে আকাঙ্ক্ষামাত্র করে নি; সে নীরবে নিভৃতে গোপনে মৃত্যুকে বরণও করেছিল। তার এই আত্মবিসর্জনের মধ্যে তো কোনো ছলনা থাকতে পারে না। প্রেমের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন দেবার মত শক্তি কয়জনের থাকতে পারে? দলনীর ছিল, প্রতাপের ছিল, আর সেই সঙ্গে নির্দ্বিধায় বলব—রোহিণীরও ছিল।

লিটল ম্যাগাজিন ও বঙ্কিম

"কেহ কেহ সকল কর্মে অকর্মণ্য বলিয়া সম্পাদক হইয়াছেন ; ভাবিয়াছেন সংবাদপত্র সম্পাদন অতি সহজ কথা। কতকগুলো গালিগালাজ করিতে পারিলেই হইল। কটুক্তি যত লেখা যাইবে পাঠকের তত মিষ্ট লাগিবে। আবার তাহাতে গ্রাহক বাড়িবে, বড় লোকে ভয় পাইবে, হাকিমেরা হাতে ধরিবে, ক্রমে যাহা ইচ্ছা তাহাই হইতে পারিব। এরূপ নীচাশয় সম্পাদক অধিক দিন স্থায়ী হয়েন না।" —বঙ্গদর্শন

সব কালেই দেখা যায় দু-চারটি বড় পত্রিকা শাল সেগুনের মত দাঁড়িয়ে উঠে জনপ্রিয়তার আকাশ ছোঁয় ; আর সেই গাছেরই তলায় হঠাৎ বর্ষার জলে গজিয়ে ওঠা ভুইচাপার মত অনেক লিটল ম্যাগাজিন—স্বল্পায়ু ছোট ছোট পত্রিকা জন্ম নেয়।

তুলনায় একালের চেয়ে সেকালে লিটল ম্যাগাজিন অনেক বেশি বেরত—একথা নিঃসংশয়ে বলতে পারি।

বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন বড় পত্রিকার বাঘা সম্পাদক ; বড় মানে বঙ্গদর্শনের মত একেবারে সর্বোচ্চ মানের বিখ্যাত পত্রিকার। এই পত্রিকার নিয়মিত পাঠক রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে "বঙ্কিম নিজে দেশব্যাপী একটি ভাবের আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই আন্দোলনের প্রভাবে কত চিত্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল, এবং আপন ক্ষমতার সীমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া কত লোক যে এক লম্ফে লেখক হইবার চেষ্টা করিয়াছিল তাহার সংখ্যা নাই।" রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গেই বলেছেন, "কত কাব্য নাটক উপন্যাস, কত প্রবন্ধ, কত সমালোচনা, কত মাসিকপত্র, কত সংবাদপত্র বঙ্গভূমিকে জাগ্রত প্রভাত কলরবে মুখরিত করিয়া তুলিল।"

বর্তমান নিবন্ধে আমাদের আলোচনার বিষয় ওই কলরব মুখরিত সদ্যোজাত সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলি প্রসঙ্গে। এই সব লিটল

ম্যাগাজিনে বঙ্কিমচন্দ্র কখনো লিখেছেন কি না, এই সব ম্যাগাজিনের সম্পাদকদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ কিছু ছিল কি না, এই ছোট বা মাঝারি পত্র-পত্রিকার প্রতি তিনি কিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন—ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কে আমাদের কৌতূহল ও ঔৎসুক্য জাগে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও পরে রবীন্দ্রনাথ—দুজনেই ভুঁইফোঁড় কাগজ ও তার সম্পাদকদের নিয়ে রীতিমত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ও রসিকতা করেছেন। কমলাকান্তের দপ্তরের সেই বড় বাজারের কথা সহজেই মনে পড়ে। কমলাকান্ত চক্রবর্তী ঢুকেছেন সাহিত্যের বড় বাজারে। সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের দোকান পার হয়ে এসে কমলাকান্ত বলছেন, "আরও একখানি দোকান দেখিলাম—অসংখ্য শিশুগণ এবং অবলাগণ তাহাতে ক্রয়-বিক্রয় করিতেছে—ভিড়ের জন্য তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলাম না—জিজ্ঞাসা করিলাম—'এ কিসের দোকান?' বালকেরা বলিল—'বাঙ্গালা সাহিত্য।' 'বেচিতেছে কে?' 'আমরাই বেচি। দুই একজন বড় মহাজনও আছেন। তদ্ভিন্ন বাজে দোকানদারের পরিচয় পশ্বাবলী নামক গ্রন্থে পাইবেন।' 'কিনিতেছে কে?' 'আমরাই।' বিক্রেয় পদার্থ দেখিবার বাসনা হইল। দেখিলাম—খবরের কাগজ জড়ানো কতকগুলি অপক্ক কদলী।"

শুধু যে সেকালের আধ পাকা কাগজগুলো নিয়েই রঙ্গ করেছেন, তাই নয়, সেই সঙ্গে সেকালের তথাকথিত ক্ষুদে সম্পাদকদের নিয়েও বঙ্কিম যথেষ্ট ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করেছেন। এমন কি তাঁর উপন্যাসের মধ্যেও এ-রকম এক সম্পাদকের চরিত্র এঁকে মনের ঝাল মিটিয়েছেন।

সেই সম্পাদকের সম্পাদিত পত্রিকাটির নাম 'স্তুশ্চুভিশ্চশাৎ পত্রিকা' আর এর মহামান্য এডিটরটি হলেন আমাদের রজনী উপন্যাসের সকলের পরিচিত সেই দুশ্চরিত্র হীরালাল। বঙ্কিম স্বল্প কয়েকটি কথায় সম্পাদক-হীরালালের চরিত্রটি চমৎকার এঁকে দিয়েছেন।

"হীরালাল নামে চাঁপার এক ভাই ছিল—চাঁপার অপেক্ষা দেড় বৎসরের ছোট। হীরালাল মদ খায়—তাহাও অল্প মাত্রায় নহে।

শুনিয়াছি, গাঁজাও টানে। তাহার পিতা তাহাকে লেখা পড়া শিখান নাই—কোনো প্রকারে সে হস্তাক্ষরটি প্রস্তুত করিয়াছিল মাত্র, তথাপি রামসদয়বাবু তাহাকে কোথা কেরানিগিরি করিয়া দিয়াছিলেন। মাতলামির দোষে সে চাকরিটি গেল। হরনাথ বসু, তাহার দমে ভুলিয়া, তাহাকে লাভের আশায় তাহাকে দোকান করিয়া দিলেন। দোকানে লাভ দূরে থাক, দেনা পড়িল—দোকান উঠিয়া গেল। তারপর কোনো গ্রামে বারো টাকা বেতনে হীরালাল মাষ্টার হইয়া গেল। সে গ্রামে মদ পাওয়া যায় না বলিয়া হীরালাল পলাইয়া আসিল। তারপর সে একখানা খবরের কাগজ করিল। দিনকতক তাহাতে খুব লাভ হইল, বড় পসার জাঁকিল—অশ্লীলতা দোষে পুলিসে টানাটানি আরম্ভ করিল—ভয়ে হীরালাল কাগজ ফেলিয়া রূপোষ হইল। কিছুদিন পরে হীরালাল আবার হঠাৎ ভাসিয়া উঠিয়া ছোটবাবুর মোসায়েবি করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ছোটবাবুর কাছে মদের চাল নাই দেখিয়া আপনা আপনি সরিল। অনন্যোপায় হইয়া নাটক লিখিতে আরম্ভ করিল। নাটক একখানিও বিক্রয় হইল না। তবে ছাপাখানার দেনা শোধিতে হয় না বলিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইল। এক্ষণে এ ভবসংসারে আর কূল কিনারা না দেখিয়া—হীরালাল চাঁপাদিদির আঁচল ধরিয়া বসিয়া রহিল।”

অন্ধ রজনী হীরালালের প্রস্তাব মত তাকে বিয়ে করতে রাজি না হলে হীরালাল রজনীকে ‘অতি কদর্য অশ্রাব্য ভাষায়’ গালি দিয়েছিল। হীরালাল যাবার সময় রজনীকে শাসিয়ে গিয়েছিল—সে আবার খবরের কাগজ করে রজনীর নামে আর্টিকেল লিখবে। অর্থাৎ সোজা কথা, মিথ্যা কুৎসা রটাবে।

সৌখীন লেখক ও সাময়িকপত্র পত্রিকা—উভয়কে নিয়ে কৌতুকাশ্রিত বিয়োগাত্মক কাহিনী রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর তারাপ্রসন্নের কীর্তি গল্পটিতে। সেকালের সাহিত্যের বাজারে অনেক সময়েই দেখা গেছে, জীবনে যার আর কোনো গতি হয় নি সেই-ই

গ্রন্থকর্তা বা এডিটর হয়ে বসেছে। ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত একটি কবিতার দু-চার ছত্র এই প্রসঙ্গে এখানে উদ্ধার করি—

এখন গ্রন্থকর্তা ঘরে ঘরে,
Editor বহু নরে,
কিন্তু কলম যে কিরূপে ধরে
তা অনেকে জানে না।
ভূষিমাল গর্দাভরা
ভেতরেও ময়লা পোরা,
কাগজগুলা কেবল ভাল
Binding পরিপাটি ;
একখানা বিকোয় না দেশে,
মসলা বান্ধে, অবশেষে,
তবু কত সর্বনেশে,
কলম ধরতে ছাড়ে না।

তারাপ্রসন্নের কীর্তি গল্পে রবীন্দ্রনাথ শুধু যে তারাপ্রসন্নের কাহিনী বিবৃত করেছেন তাই নয়, সেই সঙ্গে সেকালের সাধারণ পত্র-পত্রিকার চরিত্রও খানিকটা ফুটিয়ে তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পের মধ্যে যে-সব কাগজের নাম করেছেন সেগুলি হল: গৌড়বার্তাবহ, নবপ্রভাত, ভারতভাগ্যচক্র, শুভজাগরণ, অরুণালোক, সংবাদতরঙ্গভঙ্গ, আগমনী, উচ্ছ্বাস, পুষ্পমঞ্জরী, সহচরী, সীতা-গেজেট, অহল্যা লাইব্রেরি প্রকাশিকা, ললিত সমাচার, কোটাল, বিশ্ববিচারক, লাবণ্যলতিকা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য এগুলি সবই কবি-কল্পিত নাম। তবে এ-রকম নামেই যে সেকালের পত্র-পত্রিকার নামকরণ হত—তা সকলেরই জানা।

ছোট পত্রিকার সম্পাদকের ট্রাজেডির স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ অতি নিপুণ তুলিতে এঁকেছেন 'সম্পাদক' গল্পটিতে। কবি নিজে দীর্ঘকাল নানা পত্র-পত্রিকা সম্পাদন করেছেন। তাই সম্পাদক জীবনের সুখ দুঃখ বিষাদ আনন্দ তিনি একেবারে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছিলেন।

কাগজ যখন চলে তখন সকলেই খোসামোদ করে, মান্যগণ্য করে, প্রতাপ প্রতিপত্তি মর্যাদা বাড়ে; তারপর কাগজ হঠাৎ পড়ে গেলে সম্পাদকের সম্মান হারায়—এমন কি সেই অচলপত্রের এডিটরকে দেখে লোকে মুখ ফিরিয়ে হাসে।

সেকালে ছোট ছোট কাগজে পরস্পরের মধ্যে কিভাবে কলহ বেধে যেত তারও ছবি আছে 'সম্পাদক' গল্পটির মধ্যে। সম্পাদক গল্পটিতে নায়কের নাম নেই; লেখক উত্তম পুরুষেই এই ছোট গল্পটি রচনা করেছেন। গল্পের নায়ক জাহির প্রকাশের সম্পাদক কাগজের নেশায় ডুবে কেমন করে মাতৃহারা তার একমাত্র শিশুকন্যা প্রভাকে হারাতে বসেছিল এবং শেষে কাগজ ফেলে রোগকাতর কন্যাকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে কেমন করে সুখী হল; তার অতি বেদনামধুর চিত্র রবীন্দ্রনাথ একেবারে জীবন্ত করে ফুটিয়ে তুলেছেন এই গল্পে। ভূপতি যেদিন সম্পাদকের আসন থেকে নেমে অত্যন্ত ম্লান মুখে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে অন্তঃপুরে প্রবেশ করল, সেদিন কি চারুর হৃদয়-মন্দিরের দরজা ভূপতির জন্য খোলা ছিল? সম্পাদক গল্পে বালিকা প্রভা সম্পাদক 'বাবার চেয়ে মাটির পুতুল ঢের ভালো সঙ্গী' বিবেচনা করেছিল; আর নষ্টনীড় গল্পে 'কাগজের আবরণ ভেদ' করে যুবতী স্ত্রী চারু তার সম্পাদক স্বামীটিকে অধিকার করতে না পেরে কখন যে হৃদয়মধ্যে অমলকে ধ্যান করতে আরম্ভ করেছে তার খবর চারুরও বোধহয় সবটুকু জানা নেই। সম্পাদক গল্পের নায়ক শেষ মুহূর্তে কন্যা প্রভাকে তার বুকের মধ্যে ফিরে পেয়েছিল, কিন্তু নষ্টনীড়ের ভূপতি সম্পাদকী পালা সাঙ্গ করে অন্তঃপুরে স্ত্রী-চারুর কাছে ফিরে গিয়েও ফিরে পেল না চারুলতাকে আর কোনোদিনো।

রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় গল্পের সঙ্গে তাঁর নিজের সম্পাদক-জীবনের কি কোনো যোগসূত্র আছে? গল্পটি রচনার সময়-কালের সঙ্গে যে তাঁর সম্পাদক-জীবনের কিছু যোগ আছেই—তা স্বীকার করতে হবে। এই গল্প রচনার পূর্বে রবীন্দ্রনাথ আংশিকভাবে বালক ও হিতবাদী পত্রিকায় সম্পাদনার কাজ করেছেন, আর পূর্ণ সম্পাদকের কাজ করেছেন সাধনা

(১৩০১) ও ভারতী (১৩০৫) পত্রিকায়। এই গল্পটি সেই মুহূর্তে ভারতী (১৩০৮ বৈশাখ—) পত্রিকায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হতে শুরু হল যেদিন থেকে (১৩০৮ বৈশাখ—) রবীন্দ্রনাথ আবার একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদকের সিংহাসনে আরোহণ করলেন। রবীন্দ্রনাথ কি কল্পনায় সেদিন নিজের জীবনে ভূপতির ট্রাজেডি আশঙ্কা করেছিলেন ? কবি কল্পনা দিয়ে যে কাহিনী রচনা করলেন পরবর্তী কালে সেই কাহিনীর ঘটনাই যে তাঁর জীবনে একেবারে নিদারুণ সত্য হয়ে দেখা দেবে—একথা কে ভেবেছিল ? না ভাবতে পারলেও যা ঘটেছে তা তো সত্যই। এক অগ্রহায়ণে (১৩০৯) নষ্টনীড় শেষ হল, আর তার ঠিক পরের অগ্রহায়ণে (১৩১০) কবিপত্নী মৃণালিনী দেবীর মৃত্যু ঘটলো অকালে। স্ত্রীর মৃত্যুকালে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নবপর্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদকের উচ্চ মঞ্চে অধিষ্ঠিত। স্ত্রীর স্মরণে কবি তাঁর নিজের কাগজেই ওই বছরের ফাল্গুন সংখ্যায় লিখলেন—

পাগল বসন্তদিন কতবার অতিথির বেশে
তোমার আমার দ্বারে বীণা হাতে এসেছিল হেসে ;
লয়ে তার কত গীত কত মন্ত্র মন ভুলাবার,
জাদু করিবার কত পুষ্পপত্র আয়োজনভার।—
কুহুতানে হেঁকে গেছে, 'খোলো ওগো, খোলো দ্বার খোলো।
কাজকর্ম ভোলো আজি, ভোলো বিশ্ব, আপনারে ভোলো।'
এসে এসে কত দিন চলে গেছে দ্বারে দিয়ে নাড়া—
আমি ছিনু কোন্ কাজে, তুমি তারে দাও নাই সাড়া।
আজ তুমি চলে গেছ, সে এল দক্ষিণবায়ু বাহি—
আজ তারে ক্ষণকাল ভুলে থাকি হেন সাধ্য নাহি।
আনিছে সে দৃষ্টি তব, তোমার প্রকাশহীন বাণী,
মর্মরি তুলিছে কুঞ্জে তোমার আকুল চিত্তখানি।
মিলনের দিনে যারে কতবার দিয়েছিনু ফাঁকি
তোমার বিচ্ছেদ তারে শূন্য ঘরে আনে ডাকি ডাকি।

আবার এই রবীন্দ্রনাথই পাঁচ মাস যেতে না যেতে বন্ধু মোহিত সেনকে লিখলেন, "আমি বঙ্গদর্শনের সম্পাদক আমি কম লোক নই— অতএব কেবল অন্তঃপুরে কাটালে চলবে না।"

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বলতে বসে প্রসঙ্গক্রমে কখন যে রবীন্দ্রনাথের সম্পাদকী কাহিনীর অন্তঃপুরে ঢুকে পড়েছি খেয়াল নেই। যাই হোক, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ থেকে আবার মূল বঙ্কিম প্রসঙ্গে ফিরে আসি। কল্পিত সাময়িকপত্র ও তার সম্পাদকদের জীবনকথা ছেড়ে আমরা চলে আসি সত্যিকারের সাময়িক পত্র-পত্রিকার পাতায়। সেকালের লিটল ম্যাগাজিনগুলোর চরিত্র কি রকম ছিল, কি ধরনের লেখা বেরত সেসব কাগজের পাতায়, বঙ্কিম-সম্পাদিত বঙ্গদর্শন পত্রিকায় এসব কাগজের কি রকম সমালোচনা ছাপা হত, বঙ্কিম তাদের সর্বদাই বিরোধিতা করতেন, নাকি কখনো আনুকূল্যও করতেন—দেখা যাক। বঙ্কিম-কর্তৃক সম্পাদিত বিখ্যাত বঙ্গদর্শন পত্রিকা থেকে তৎকালীন কয়েকটি পত্রিকার সমালোচনা তুলে আনলাম।

১

আর্য প্রবর। তত্ত্ববোধক মাসিক পত্র। পত্রখানির বাহ্যদৃশ্য উত্তম, ভালো কাগজে পরিষ্কার রূপে ছাপা হইয়াছে। বিষয়গুলিও মন্দ নহে; চিত্তাকর্ষক বটে, এবং যত্নসংগৃহীত, কিন্তু রচনা প্রাঞ্জল বা প্রণালীবদ্ধ নহে। কাগজখানির উদ্দেশ্য উৎকৃষ্ট, কিন্তু সম্পাদক মহাশয়কে আমরা অনুরোধ করি, তিনি যেন কেবল প্রকৃত ঘটনা ও বিচারের প্রতি অধিক দৃষ্টি রাখেন।

২

জ্ঞানাঙ্কুর। সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস সম্বন্ধীয় মাসিক পত্র। এই পত্রখানির কলেবর দেখিয়া অনেকের ভক্তির অভাব জন্মিবে। মন্দ কাগজে মন্দ ছাপা, দেখিয়া অশ্রদ্ধা হইবে। কিন্তু যে পরিমাণে অশ্রদ্ধা হইবে, ভিতরে পড়িয়া সেই পরিমাণে ভক্তি এবং সুখের উদয় হইবে।

যদি অন্যান্য সংখ্যা প্রথম সংখ্যার তুল্য হয়, তবে ইহা যে বাংলা পত্রের মধ্যে একখানি অত্যুৎকৃষ্ট পত্র হইবে, তদ্বিষয়ে কোনো সংশয় নাই। দেখা যাইতেছে যে লেখকেরা কৃতবিদ্য, চিন্তাশীল এবং লিপিপটু। ভরসা করি, পত্রখানি স্থায়ী হইবে। অধ্যক্ষকে আমরা অনুরোধ করি যে, পত্রখানি কলিকাতায় ছাপাইবেন। সুন্দরীকে জীর্ণ মলিন বসনাবৃতা দেখিলে যেরূপ কষ্ট হয়, জ্ঞানাঙ্কুর দেখিয়া আমাদের সেইরূপ কষ্ট হইয়াছে।

ইহার মধ্যে একটি প্রবন্ধ ইংরাজিতে লিখিত হইয়াছে। আমরা জিজ্ঞাসা করি, কেন? কাণ্ট দর্শন বাংলায় লেখা নিতান্ত কঠিন, ইহা স্বীকার করি। কিন্তু আমরা বলি যে, আমরা বাঙালী, বাঙালীর জন্য লিখিতেছি। যদি বাংলায় কাণ্ট দর্শন বুঝাইয়া লিখিতে পারি, লিখিব, বাংলায় বুঝাইয়া লিখিতে না পারি, লিখিব না। এরূপ প্রবন্ধ যে ইংরাজিতে লিখিবার কোনো প্রয়োজন নাই, এমন আমরা বলি না। কিন্তু তেলা মাথায় তেল দেওয়া, এখন দুদিন থাক। যাহাদের রুক্ষ কেশ, তাহাদের জন্য আগে তৈলের কুলান করিয়া উঠা যাউক।

৩

বিশ্বদর্শন। পাক্ষিক পত্র। প্রবন্ধগুলিন সাধারণ স্কুলের ছাত্রের লিখিত বলিয়া বোধ হইল।

৪

তমোলুক পত্রিকা। মাসিক পত্র। ইহার দুই খণ্ড প্রাপ্ত হইয়া আমরা আনন্দিত হইয়াছি। আনন্দের প্রথম কারণ এই যে তমোলুক হইতে একখানি সাহিত্য বিষয়ক পত্র প্রচারারম্ভ হইয়াছে। দ্বিতীয় আনন্দের বিষয় এই যে, এই পত্রখানি উৎকৃষ্ট।

লেখকদিগের লিপিশক্তি ও পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, যদিও তমোলুক সামান্য নগর, তথাপি তথা যে মাসিক পত্র প্রচারিত হইয়াছে, তাহা রাজধানীর অধিকাংশ সাহিত্য বিষয়ক পত্রাপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

যাঁহারা এই কার্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের বিশেষ প্রশংসা

করিতে হয়। তাঁহারা যে দেশহিতৈষী, সুযোগ্য এবং সাহিত্যপ্রিয়—তমোলুক পত্রিকা তাহার প্রমাণ।

৫

মাসিক প্রকাশিকা। মাসিক পত্র ও সমালোচন। লেখকেরা বোধ হয়, অল্প বয়স্ক। এজন্য বিশেষ সমালোচনা নিষ্প্রয়োজনীয়। মধ্যে মধ্যে রচনা মন্দ নহে।

৬

অবকাশ-তোষিণী। মাসিক পত্র ও সমালোচন। পত্রখানির আকার ক্ষুদ্র, কিন্তু ভবিষ্যতে বৃদ্ধির ভরসা আছে। লেখা যতদূর পড়িয়াছি, ততদূর সন্তোষজনক বোধ হইয়াছে।

৭

হরবোলা ভাঁড়। প্রথম ভাগ প্রথম সংখ্যা। এখানি বোধ হয় মাসিকপত্র। রহস্য ইহার উদ্দেশ্য। অনেকগুলি চিত্র ইহাতে আছে। 'পঞ্চ' নামক ইংরেজি পত্রের চিত্রের অনুকরণে এই সকল চিত্র প্রণীত হইয়াছে। চিত্রগুলি উত্তম হইয়াছে।···একটা স্থূল কথা বলিয়া রাখিলে ক্ষতি নাই। গালি এবং ব্যঙ্গ দুইটি পৃথক বস্তু ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য। গালি ভদ্রের পরিহার্য, তদ্দারা কোনো কার্য সিদ্ধ হয় না। ব্যঙ্গ সকলের আনন্দদায়ক; এবং সুলেখকের হস্তে তাহা মহাস্ত্র। অনেক লেখক গালিকেই ব্যঙ্গ মনে করেন; পক্ষান্তরে অনেক পাঠক ব্যঙ্গকে গালি মনে করেন। আবার অনেকে নিরর্থক ছেবলামিকে ব্যঙ্গ মনে করেন। আমরা ভরসা করি, ভাঁড়ের এ-সকল দোষ ঘটিবে না।

৮

হেমলতা। প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা। পাক্ষিক পত্র। অনেক দিন হইল এখানি পাওয়া গিয়াছে। সময়াভাবে বা স্থানাভাবে সমালোচিত হয় নাই। সম্পাদক বলিয়াছেন ইহাতে সুশিক্ষিতা স্ত্রীলোক লিখিবেন। আমাদের অনুরোধ, যেগুলি স্ত্রীলোকের সেগুলি স্ত্রীলোকের বলিয়া চিহ্নিত করা থাকে। এ সংখ্যায় সেরূপ নাই বলিয়া আমরা হেমলতার সম্যক

সমালোচনা করিতে পারিলাম না। আর একটি, যাহাতে স্ত্রীলোকে লিখিবে, তাহা অধিকতররূপে স্ত্রীলোকেরই পাঠ্য হইবার সম্ভাবনা। তবে হেমলতার মধ্যে এত ইংরেজির ছড়াছড়ি কেন? ইহার মধ্যে যে পরিণয় কুসুম নাটক প্রকাশিত হইতেছে, তাহা আর না প্রকাশিত হইলেই ভাল হয়। যাহা হউক আমরা হেমলতার স্থিতি ও উন্নতি আন্তরিক ইচ্ছা করি।

বঙ্গদর্শনের সূচনা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধান কাল—এই বাইশ বছরের মধ্যে বড় ছোট মাঝারি পত্র-পত্রিকা মিলিয়ে মোট প্রকাশিত কাগজের সংখ্যা ছয় শত। অর্থাৎ সেকালে প্রতি বছরে গড়পড়তা প্রায় ২৭-২৮টি পত্র-পত্রিকা ছাপা হয়ে বাজারে বেরিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন সাহিত্যের সম্রাট; তাঁর ধারে কাছে সাহিত্যের সাধারণ প্রজারা আসা-যাওয়ার সুযোগ পেত না মোটেই। সুতরাং লিটল ম্যাগাজিনে বঙ্কিমের লেখার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তিনি সারা জীবন বঙ্গদর্শনেই মুখ্যত যা-কিছু লিখেছেন। তাছাড়া তাঁর অনুগত শিষ্য বঙ্গদর্শনের লেখক অক্ষয় সরকার সম্পাদিত সাধারণীর এক-আধ সংখ্যায় ও নবজীবনের কয়েকটি সংখ্যায়; মেজদাদা সঞ্জীবচন্দ্রের ভ্রমরে দু-তিন সংখ্যায় এবং জামাতা রাখালচন্দ্রের প্রচারে শেষের কয়েক বছর বঙ্কিমচন্দ্র লেখালেখি করেছেন। রাখালচন্দ্রের নাম থাকলেও আসলে বঙ্কিমই ছিলেন প্রচারের মুখ্য পরিচালক। বঙ্কিমচন্দ্রের কালে উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকার মধ্যে ছিল ভারতী, বালক, সাহিত্য, হিতবাদী, সাধনা ইত্যাদি কাগজ। এইসব কাগজের সম্পাদকরা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছ থেকে লেখা আদায়ের জন্য কম পরিশ্রম করতেন না। সকলেরই ইচ্ছা বঙ্কিম-বাবুমশাই তাঁদের পত্রিকাতেও কিছু লিখুন। কখনো কখনো নিরুপায় হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লেখার আশ্বাসও দিতেন। নিজেরও হয়তো আর দু-পাঁচটা পত্রিকায় অল্পস্বল্প লেখার ইচ্ছা জাগতো। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাজের চাপে ও ভগ্নস্বাস্থ্যের কারণে লিখে উঠতে পারতেন না।

পত্রিকা প্রকাশ করা বাঙালী জাতির এক বিচিত্র নেশা। সুখে দুঃখে বর্ষায় বসন্তে সেই গত শতাব্দী থেকে বাঙালী বারো মাস পত্রিকা বের করে চলেছে একটির পর একটি। নেশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে নিদারুণ দুঃখ ও বিপর্যয়ের মুহূর্তেও। আর তাই ভূপতি চারুলতাকে হারিয়ে আবার একটা কাগজের সম্পাদকী ভার নিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেছে। এই নেশাটুকু ছাড়া তার আর বেঁচে থাকার অন্য উপায় ছিল না।

বঙ্কিম বিষয়ক প্রস্তাব

"বঙ্গভারতীর সাথে মিলায়ে তোমার আয়ু গণি,
তাই তব করি জয়ধ্বনি।" —রবীন্দ্রনাথ

সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের চতুর্দশ দশক পূর্ণ হয়েছে। আর কয়েক বৎসর পরেই পূর্ণ হবে তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষ। অপরদিকে তাঁর তিরোধানের পরেও অতিবাহিত হল অনেক চৈত্র মাস—আর মাত্র বারো-তেরো বছর পরে তাঁর মৃত্যুও শততমবর্ষে এসে পৌঁছবে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আমাদের লেখককুলগুরু বলে অভিহিত করে গেছেন, আমরাও তাঁকে সাহিত্যের সম্রাট বলে মান্য করি, জাতীয় সংগীত বন্দেমাতরমের স্রষ্টা-রূপে তিনি সমগ্র ভারতবাসীর বরণীয় পুরুষ। আকাশবাণীর প্রভাতী অনুষ্ঠানে প্রচারিত যে-মন্ত্র কোটি কোটি ভারতবাসীকে প্রত্যহ জাগরিত করছে নিদ্রা থেকে, সে গানের নাম বন্দেমাতরম। একটি প্রভাতী পত্রিকার সম্পাদকীয় স্তম্ভের উপরে যে বিজয়-কেতনটি রয়েছে তাতে প্রতিদিনই মুদ্রিত হয় 'বন্দেমাতরম্'—স্বর্ণাক্ষরে লিখিত এই কটি অক্ষর ; পত্রিকার সূত্রে প্রত্যহ বাঙালীর ঘরে ঘরে গিয়ে পৌঁছচ্ছে সে মন্ত্র—দেশে ও বিদেশে।

সুতরাং কেউ যদি এখন বলেন যে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমরা একালে বিস্মৃত হয়েছি তবে সে কথা আদৌ স্বীকার্য নয়। পরিতাপের বিষয় হল তাঁকে প্রতিদিন স্মরণ করেও তাঁর জন্য আমরা আজও পর্যন্ত বিশেষ কিছুই করে উঠতে পারলাম না।

আজও পর্যন্ত আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের গুটি দশেক ফটোগ্রাফও সংগ্রহ করে উঠতে পারিনি। বঙ্কিমসমকালীন রমেশচন্দ্র দত্তের কত অজস্র ফটোগ্রাফ আমরা পেয়েছি, বঙ্কিমের মৃত্যুকালে রবীন্দ্রনাথের বয়স হয়েছিল তেত্রিশ—সেই পর্বের মধ্যে কবির কত ছবি ও কত পাণ্ডুলিপি

আমরা সংগ্রহ করতে পেরেছি, পারিনি শুধু সেই বহু মুদ্রিত বঙ্কিমের দু-চারটির বেশি ফটোচিত্র সংগ্রহ করতে।

ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্র রয়েছে রবীন্দ্রচর্চার ব্যবস্থা, রয়েছে রবীন্দ্রসদন বা রবীন্দ্রভবন; অথচ আজও যথার্থ একটি বঙ্কিমগবেষণা কেন্দ্র বা বঙ্কিমভবন আমাদের এই সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমিতেও গড়ে উঠল না।

১৯৬৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি আনন্দবাজার পত্রিকায় লিখেছিলাম, "যাঁরা সত্যিকারের বঙ্কিম-অনুরাগী তাঁদের পক্ষ থেকে আমার বক্তব্য, কলকাতায় এমন একটি বঙ্কিম-ভবন গড়ে উঠুক যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সকল তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারে।" অতঃপর 'দিন পরে যায় দিন', কিন্তু 'কিছুই না পাইলাম যাহা কিছু চাই।'

আমরা আজও একত্রে কোথাও সংগ্রহ করে উঠতে পারলাম না বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থগুলির প্রথম সংস্করণ। শুনেছি বিদেশে তাঁর কোনো কোনো বইয়ের প্রথম সংস্করণ নাকি কেমন করে চলে গেছে—যে কপি এদেশে এখন দুর্লভ।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে তাঁর প্রতিটি বইয়েরই প্রভূত সংস্কারসহ সংস্করণ হয়েছিল। তাঁর সকল গ্রন্থের সকল সংস্করণই আমাদের উদ্ধার করা দরকার। বঙ্কিমের জীবৎকালে দুর্গেশনন্দিনীর তেরটি সংস্করণ ছাপা হয়। এগুলি একত্রে একজন গবেষক কোথায় পাবেন? বঙ্কিমভবনে এই সবকিছু একত্রে সংগৃহীত হওয়া প্রয়োজন।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবৎকালে দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় তাঁর সম্পর্কে যত সংবাদাদি প্রকাশিত হয়েছে তা-ও সংগ্রহ করার কাজ হবে বঙ্কিমভবনের।

সমস্ত ভারতীয় ভাষায় এবং অভারতীয় ভাষায় আজ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে যত গ্রন্থ এবং পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে তা সবিশেষ সংগৃহীত হওয়া দরকার।

অদ্যাবধি বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র রচনা আমরা উদ্ধার করতে পারি নি।

এখনও তাঁর অনেক লেখা রচনাবলী-বহির্ভূত অ'ছে। তাঁর উপন্যাস ও প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির পূর্ণাঙ্গ পাঠভেদ সংবলিত প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক। তাঁর রচনাবলীও নূতন করে সম্পাদন করা প্রয়োজন। তাঁর চিঠিপত্রেরও একটি প্রামাণিক সংকলন দরকার।

এখনও পর্যন্ত ব‌ঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র উপন্যাসের ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হল না। এ-সব কাজে আমরা যদি আজও হাত না দিই তবে তাতে ক্ষতি বঙ্কিমের নয়, আমাদের, বাঙালীর তথা ভারতবাসীর। পৃথিবীর মানুষ আমাদের সাহিত্যের সঙ্গে কেমনভাবে পরিচিত হবে? অবশ্যই ইংরেজি অনুবাদের মাধ্যমে, যে ভাষার সাহায্যে আমরা পৃথিবীর সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ পাই। এ-কাজে আমরা যদি অগ্রসর না হই তবে পৃথিবীর সাহিত্য থেকে বঙ্কিমচন্দ্র হারিয়ে যাবেন, বিস্মৃত হবেন রবীন্দ্রনাথও। এ-কাজ এই মুহূর্তে অত্যন্ত জরুরী এবং জাতীয় কর্তব্য হিসাবে এই অবশ্যকরণীয় কর্মে আমাদের অবিলম্বে হাত দিতে হবে।

বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ করে বলেছিলেন বাঙালী জাতির ইতিহাস নেই। আমরা একালে বেদনার সঙ্গে বলি বঙ্কিমের একটি জীবনেতিহাস নেই। অদ্যাবধি সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের একখানি প্রামাণিক জীবনী রচিত হল না। শচীশ চট্টোপাধ্যায়ের লেখা জীবনী প্রাথমিক কাজ হিসাবে মূল্যবান। তবে তাঁর রচনায় কল্পনা প্রবণতার আতিশয্য আছে। তিনি নিজেও ছিলেন মুখ্যাত একজন উপন্যাস রচয়িতা. সেদিকের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশি। তাঁর লেখা জীবনীগ্রন্থের অনেকটা অংশই হল বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য পদ্য এবং ইংরেজি রচনার সংকলন। তাছাড়া তাঁর গ্রন্থটি প্রকাশের পর বহু বৎসর কাল অতিবাহিত হয়েছে—ইতিমধ্যে বঙ্কিম বিষয়ে প্রকাশিত হয়েছে বহু শত তথ্য, মুদ্রিত হয়েছে কত গবেষণা গ্রন্থ, সংকলন গ্রন্থ এবং মূল্যবান তথ্যসমৃদ্ধ প্রবন্ধ-নিবন্ধ-সমালোচনা।

প্রায় দুই দশক পূর্বে একবার শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত একটি

মাসিকপত্রে বঙ্কিম জীবনী রচনার কাজে হাত দিয়েছিলেন। কয়েক কিস্তি প্রকাশের পর সে পরিকল্পনা তিনি পরিত্যাগ করেন। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'বঙ্কিম সরণী' গ্রন্থের ভূমিকায় লেখেন, "শ্রীরবীন্দ্র-কুমার দাশগুপ্ত কথাসাহিত্যে বঙ্কিম জীবনী লিখতে আরম্ভ করলে অনেকেই আশ্বস্ত হয়েছিল—এতদিনে বঙ্কিমচন্দ্রের একখানা নির্ভরযোগ্য জীবনী পাওয়া যাবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে তাঁর কলম কালিদাসের মেঘের চেয়েও মন্থরতর।" শ্রীযুক্ত দাশগুপ্তের সেই উদ্যোগের পরে কেটে গেল অনেকগুলি বৎসর।

রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে শ্রদ্ধেয় প্রভাতবাবুর রবীন্দ্রজীবনীর ওই চারটি খণ্ড না থাকলে আমাদের যে কি দশা ঘটত তা আজ ভাবতেও পারি না; অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় নয় দশকের মধ্যেও আমরা আজ পর্যন্ত একখানি পূর্ণাঙ্গ প্রামাণিক বঙ্কিমজীবনী লিখে উঠতে পারলাম না। দু'টো রাস্তার নাম সহজে গোবিন্দচন্দ্রকে বঙ্কিমচন্দ্র করা যেতে পারে; কিন্তু দেশবাসীর পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি আমাদের যথার্থ কর্তব্য পালনের সময় বোধ করি এখন এসেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মশতবার্ষিকীতে শান্তিনিকেতনে একটি সভায় রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দিয়েছিলেন পরিশেষে তার থেকে দুটি ছত্র উদ্ধৃত করে দিই - কথাগুলি যে কবি আমাদের উদ্দেশেই বলে গিয়েছিলেন—

"তাঁর যজ্ঞবেদীটি তিনি প্রজ্বলিত করে গেছেন। তাঁর সমস্ত জীবনের চিন্ময় সম্পদ তাতে তিনি উপহার দিয়ে গেছেন। বাংলা ভাষার সেই যজ্ঞবেদীটিকে যদি তোমরা তোমাদের প্রত্যেকের সারা জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য দিয়ে পরিপূর্ণ রাখ, তবেই বঙ্কিমের যথার্থ শ্রাদ্ধ হবে। নইলে স্মৃতিসভার যত কিছু আয়োজন ও সমারোহ সবই দুঃসহ বিড়ম্বনা।"